KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : ৪/7-8 ৪/9-10 ৪/11-12	Year of Publication : মাঘ - ফাল্গুন ১৩২৮ চৈত্র - বৈশাখ ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় ১৩২৮
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২৮।

ভারতের শিক্ষার আদর্শ*

—:*:—

১৫শ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ভারত-সভ্যতার প্রধান নদীটী চারটী ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে—এক বৈদিক, দ্বিতীয় পৌরাণিক, তৃতীয় বৌদ্ধ এবং চতুর্থ জৈন। ভারতীয় চৈতন্যের উচ্চ শিখরেই ইহার গোমুখী অবস্থিত।

কোনও দেশের নদী যে শুধু সেই দেশের জন্যেই পুষ্ট হয় এমন নয়। তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র ভারতের ভাগীরথীরই উপনদী। সেইরূপ ভারতের সভ্যতার মধ্যেও অপর দেশের সভ্যতার দান আছে। মুসলমানরা বাহির থেকে বার বার ভারতে এসেছে। তাদের এই যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে যে তাদের দেশের অনেক ভাব ও চিন্তা এ দেশে এসেছে তার অনেক চিহ্নই আজও পাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গীতবিদ্যায়—স্থাপত্যবিদ্যায়—চিত্রবিদ্যায় এবং সাহিত্যের মধ্যে মুসলমানদের দানের বহুল পরিচয় আছে। যাঁরা মধ্যযুগের সাধু সন্ন্যাসীদের রচনা এবং জীবন চরিত পাঠ করেছেন—এবং মুসলমান-দের শাসনকালে এ দেশে যে সব ধর্ম্মান্দোলন উত্থিত হয়েছিল যাঁরা তার খবর রাখেন তারা নিশ্চয় জানেন এই বিদেশী মুসলমানদের কাছে আমরা কি পরিমাণে ঋণী।

*রবীন্দ্রনাথের The centre of Indian culture নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

তারপর আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার যে মহাপ্লাবন এসেছে তা তীর ভেঙ্গে সীমা অতিক্রম কর্‌বার উপক্রম কর্‌ছে—তার এই প্রচণ্ড গতি ও উচ্ছ্বাসের মুখে বুঝি সব একাকার হয়। আজ যদি আমরা তাকে স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত কর্‌তে পারি তবেই নিষ্কৃতি—তা না হলে এ থেকে আমরা যা' পাব তার কোনই মূল্য থাক্‌বে না।

অতএব আমাদের এই শিক্ষাকেন্দ্রে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, ইসলাম, জৈন, শিখ, ইত্যাদি ভারতীয় সাহিত্য—শিক্ষার ব্যবস্থা করে তারই এক পাশে ইউরোপীয় সভ্যতাকে স্থান দিতে হবে; কেবল মাত্র এই ভাবেই আমরা ইউরোপীয় সভ্যতাকে আয়ত্ত্ব কর্‌তে পার্‌ব। নদী যখন তীরের অন্তর্গত হয়ে প্রবাহিত হয় তখন সে আমাদের বশে থাকে এবং কল্যাণসাধন করে; কিন্তু বন্যা যখন তীর অতিক্রম করে তখন তা আমাদের সর্ব্বনাশেরই হেতু হয়।

সে সব সাহিত্যে আমাদের পূর্ব্বপিতামহদের জ্ঞানের সম্পদ সঞ্চিত হয়ে আছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে আমাদের প্রচলিত ভাষাকেও এই ব্যবস্থার মধ্যে স্থান দিতে হবে। এই প্রচলিত ভাষাতেই বর্ত্তমান ভারতের চিত্তের সজীব পরিচয় লাভ কর্‌ব। এই প্রচলিত ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের লোক-সাহিত্যেরও আলোচনা কর্‌তে হবে—এই লোকসাহিত্য থেকেই আমরা দেশের মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌ব—দেশের অন্তরনিহিত জীবন প্রবাহ কোন দিকে চলেছে তাও এই থেকে বুঝ্‌ব।

এমন অনেক মানুষ আছে যাদের আধুনিক কালের দ্বৈপায়ন বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। তাদের মতে অতীত একেবারে নাস্তোয়ান—তার কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে আমরা কেবল

ঋণের দায় পেয়েছি—আর কোনও সংস্থানই সে আমাদের তরে রেখে যায় নি। যে সেনাদল সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে পশ্চাৎ থেকে যে তাদের রসদ যোগাতে পারা যায় একথা তারা অস্বীকার করে। একথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিলে ভাল হয় যে যখন মানুষ অতীতের খামারের মধ্যে সহসা ভাবের বীজ আবিষ্কার করে তখনই ইতিহাসে নব জীবনের অভ্যুত্থান হয়।

যে হতভাগ্য জাতি অতীতের ফসল থেকে বঞ্চিত হয়েছে বর্ত্তমানকেও তাদের হারাতে হয়। আমাদের বীজ পর্য্যন্ত ফুঁকে দিয়ে তারা শেষে দ্বারে দ্বারে জীবিকার তরে ভিক্ষা করে ফিরে। আমরা যে বিশ্বে এইরূপ পরিত্যক্ত জাত একথা যেন আমাদের কল্পনাতেও না স্থান পায়। এখন সেই সময় এসেছে যখন আমাদের পূর্ব্বপিতামহদের গুপ্তধনাগারের দুয়ার ভাঙ্গতেই হবে এবং সেই ধন আমাদের জীবনের ব্যাপারে লাগাতেই হবে। এরই সাহায্যে আমরা আমাদের ভবিষ্যতকে আয়ত্ত্ব কর্‌তে পার্‌ব—তাহলে আর আমাদের পরের আস্তাকুঁড়ে ন্যাকড়া সংগ্রহ করে ফির্‌তে হবে না।

১৬শ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি শিক্ষার মানসিক দিকটারই আলোচনা করেছি। এই দিকটাই আমাদের কাছে পরিচিত। আমরা চন্দ্রের মত বিশ্ব-বৈদগ্ধ্য-সবিতার অভিমুখে আমাদের এই মানসিক দিক-

টাকেই উপস্থিত করি। আমাদের অন্যান্য দিকেও আলোকের প্রয়োজন আছে একথা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা ইউরোপের সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের সহিতই পরিচিত। সুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও তার ব্যাকরণ এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালার চতুঃসীমার মধ্যেই বদ্ধ। মানুষের জীবনে যে একটা রসের দিক আছে তাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করি, সে দিকটা পতিত থেকে যায় বলে সেখানে কেবল আগাছাই জন্মায়।

সঙ্গীত এবং ললিত কলাই যে জাতীয় আত্মবিকাশের প্রকৃষ্ট উপায় একথার পুনরুল্লেখ করাই বাহুল্য। যে জাত এ দুটী বিদ্যা থেকে বঞ্চিত তারা চিরমৌন থেকে যায়।

আমাদের চৈতন্য আমাদের জীবনের উপরিতলকেই অধিকার করে থাকে—এ ছাড়া আমাদের চিত্তের আর একটী চৈতন্যাতীত অবস্থা আছে—তা যেমনি অন্তরতম তেমনি গভীর। আমাদের অগোচরে সেইখানে অনন্তকালের জ্ঞান আপনিই সঞ্চিত হয়। আমাদের চৈতন্য কর্ম্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে—তার লীলা আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয়; কিন্তু আমাদের সেই অন্তরতম আত্মা জ্ঞানের মধ্যে ব্যক্ত হয় না—তাকে ব্যক্ত করতে হলে কাব্য সঙ্গীত ইত্যাদি ললিত কলার আশ্রয় নিতে হয়—এদের মধ্য দিয়েই মানুষের অন্তর্গত সম্পূর্ণ পুরুষটী অভিব্যক্ত হয়ে উঠে।

আমাদের খবরের কাগজগুলি রোজই বাচ্ছা পাড়ছে—আমাদের ঘরে ঘরে বক্তার আবির্ভাব হচ্ছে। আমরা আমাদের ইংরাজ গুরুমহাশয়ের কাছ থেকে যা' কিছু ধার করে পেয়েছি তা' এই সংবাদ পত্র চালিয়ে এবং বক্তৃতা করেই ফুঁকে দিই এবং আবেদনের

অশ্রুজলে আকাশ বাতাসকে নিরানন্দ ও আর্দ্র করে তুলি। কিন্তু আমাদের সেই শিল্পকলা কই, যা বসন্তের পুষ্পবিকাশের মত আমাদের অন্তর প্রকৃতি থেকে আপনিই ফুটে তার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যকে বিশ্বের মধ্যে ব্যক্ত করে তুলবে? তবে কি আমরা এমনি অভিশপ্ত যে চিরকাল আমাদের হৃদয়ের বেদনাকে এমনি মৌনভাবে বহন করে যেতে হবে? এই বিশ্ব-সভ্যতার উৎসবের মধ্যে কি আমাদের এতটুকুও স্থান হবে না? আমরা কি ভিক্ষুকের মত এর বাহির মহলেই অপেক্ষা করব—শেষ এক মুষ্টি অন্ন পেয়েই ফিরে যাব? এর খাসমহলে যেখানে বর্ণগন্ধগীত অজস্রতার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে কি আমরা প্রবেশাধিকার পাব না? আমরা চিরদিনই কি এই শিক্ষার কয়েদ খানায় থাকব—কেবলি কঠোর পরিশ্রম করব—অথচ দুবেলা দুটি জাব এবং লজ্জা নিবারণের তরে একখণ্ড কৌপীন ব্যতীত অপর কিছুই পাব না? আমরা কি জানি না যে জীবনের আনন্দ জীবনের শক্তিরই অন্যতম অংশ—বর্ণ—রেখা এবং ভাব জীবন্ত মানুষের হাতেই আত্ম প্রকাশ করে?

কাঠের ব্যবসায়ী মনে করতে পারেন যে বৃক্ষের পত্রপুষ্প অনর্থক অলঙ্কার মাত্র; কিন্তু এই মনে করে সে যদি পত্রপুষ্পের ধ্বংসের উদ্যোগ করে তাহলে একদিন সে দেখবে তার ব্যবসার সামগ্রী কাঠও অন্তর্হিত হয়েছে।

এ দেশের সঙ্গীত এবং ললিতকলা মোগল সম্রাটদের হাতে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করেছিল; তার কারণ তারা শুধু তাদের কার্য্যকালটুকু নয় সমগ্র জীবনটাই এখানে অতিবাহিত করতেন। মানুষের এই সমগ্রতা থেকেই কলার উৎপত্তি। যে সব পাখী ঋতুতে

ঋতুতে বাসা পরিবর্ত্তন করে আমাদের ইংরাজ শিক্ষকরা তাদেরই মত—এরা এখানে কিচ্‌মিচ্‌ করে মাত্র—এরা গান গাইতে পারে না এদের হৃদয়ই এখানে নেই—এযে তাদের নির্ব্বাসনের দেশ। ইউরোপই তাদের সঙ্গীত এবং শিল্পকলার স্বাভাবিক লীলানিকেতন। তারা সেখানে এতই বদ্ধমূল এবং গভীর যে তাদের সেখান থেকে হঠাতে হলে সেই দেশের মাটিটাকে পর্য্যন্ত হটিয়ে আন্‌তে হয়।

ইউরোপবাসিরা যেখানে শিক্ষিত, যেখানে প্রভু, যেখানে তারা রাষ্ট্রতন্ত্র এবং বানিজ্য সৃষ্টি করে আমরা কেবল তাদের সেখানেই দেখি; তারা যেখানে শিল্পকলার সৃজন করে—যেখানে তারা রসময় আমরা সেখানে তাদের সাক্ষাৎ পাই না। এই কারণেই ইউরোপের পূর্ণস্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় না; আমরা কেবল তার মানসিক শক্তি এবং সাধারণ হিতসাধনার প্রচেষ্টাকেই দেখি। অতএব সে কেবল আমাদের বুদ্ধি এবং সাধারণ হিতসাধনা-বৃত্তিকেই স্পর্শ করে ক্ষান্ত হয়।

শিক্ষার এইরূপ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আমাদের জীবন ক্রমে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়্‌ছে। অতঃপর একে প্রশ্রয় দেওয়া কোনও মতেই আর উচিত হবে না। আমরা এই যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনার প্রস্তাব কর্‌ছি সেখানে সঙ্গীত এবং ললিতকলাকে সম্মানের আসন দিতে হবে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন যুগে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সঙ্গীত এবং ললিত-কলার যে সব ভিন্ন ভিন্ন রীতি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তাকে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকে উদ্ধার করে এই খানে সংহত কর্‌তে হবে।

এইরূপে আমাদের রসবোধ এবং রুচির আদর্শ যথার্থরূপে গঠিত হয়ে উঠ্‌বে। তাহলেই আমাদের সঙ্গীত এবং শিল্পকলা সৌন্দর্য্যে

এবং সম্পদে বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে। তখন আমরা বিদেশীয় কলাকে সত্য ও সংযত ভাবে বিচার কর্‌বার ক্ষমতা লাভ কর্‌ব এবং তখন তা থেকে ভাব এবং রূপ গ্রহণ কর্‌লেও আমরা পরস্বাপহরণের অপবাদ ভাজন হব না।

১৭শ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

এই প্রবন্ধের সূচনা থেকেই আমার মনে একটা গোপন উৎকণ্ঠা জেগে আছে। সেটী এই যে আমার এই প্রস্তাবকে যে কাজের লোকের পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। যাঁরা কাজের লোক তাঁরা সম্পূর্ণতার চিত্রমাত্রকেই সন্দেহের চক্ষে দেখেন—তাঁরা নিশ্চয়ই একান্ত নির্ম্মম গাম্ভীর্য্যের সহিত এখনি বল্‌বেন "তুমি যা আলোচনা কর্‌ছ—তুমি যা' বল্‌ছ তা' সত্য এবং সুন্দর হতে পারে—কিন্তু ও সব কি কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব হবে?

আমি কাজের লোক নই; সুতরাং আমার উত্তর এই যে সত্য মাত্রেই সম্ভব। ছবির সহিত ক্যাম্বিসের যা সম্বন্ধ সত্যের সহিত সম্ভবপরতারও সেই সম্বন্ধ। সত্যের পশ্চাতে একে থাক্‌তেই হবে। যদি ভারত-শিক্ষার সম্বন্ধে আমার এই কল্পনায় এতটুকুও সত্য থাকে তবে তাকে একদিন না একদিন সার্থক হতেই হবে।

এইবার আর সব রেখে অর্থের কথাটা ভাব্‌তে হবে। এখন দেখ্‌তে হবে এমন কি ব্যবস্থা কর্‌লে এই শিক্ষালয়গুলি কালে

স্বাবলম্বনশীল হবে—কি করলে এরা ধনীর অনুগ্রহ এবং পৃষ্ঠ-পোষকতার উপর একান্তভাবে নির্ভর না করে নিজের নিজের সঞ্চিত ধনের কুসীদের উপর ব্যয়-নির্ব্বাহ করতে পারবে। ধনই হোক আর মানই হোক যখন আমরা তাদের চিরকালের তরে একবারে পাই—যখন তাদের অর্জ্জন অথবা উৎপাদন করবার তরে আমাদের আর পরিশ্রম করতে হয় না—আমরা যোগ্যই হই আর অযোগ্যই হই যখন তারা আমাদের হাত-ছাড়া হয় না তখন সেই সব অনায়াসলব্ধ সম্মান অথবা ধনের ভার আমাদের জীবনকে ক্রমান্বয়ে পঙ্গু করে ফেলে এবং আত্মার গতিরোধ করে দেয়—তখন আমরা উদ্ধত এবং বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ি। নদী তার গতিপথ পরিবর্ত্তিত করলেও তার ঘাটে ঘাটে মর্ম্মর নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী যেমন অবশিষ্ট থেকে যায় এই সব সঞ্চয়ও ঠিক সেই ভাবে পড়ে থাকে। সুতরাং আমাদের এই সব জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন ভাবে ব্যবস্থিত করতে হবে যাতে তারা চিরকালই নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন সকল মেটাবার যোগ্যতা লাভ করে—তাহলেই তারা ভবিষ্য যুগের সহিত সত্যকার যোগরক্ষা করতে পারবে—তখন তারা পরগাছার মত অতীতের বদান্যতার উপর নির্ভর করে থাকবে না।

অতএব এখন আমাদের দুটী সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে প্রথম আমাদের চিত্তের দারিদ্র্য—দ্বিতীয় বস্তুর অভাব।

এই প্রথমটীর সম্বন্ধে কতকটা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে যদি আমাদের মানসিক জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করতে হয় তাহলে আমাদের বৈদগ্ধ্যের সমূহ সম্বলকে একত্র করতেই হবে। আমরা ইংরাজি শিক্ষা হতে যা

পাই তা আমাদের চিত্তের খাদ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়—তাতে খাদ্যের কয়েকটা উপকরণ আছে মাত্র—তাও তাজা নয়—বাসি এবং টীনে ভরা। যে খাদ্যে সকল উপকরণ বর্ত্তমান তাহাই প্রকৃত খাদ্য।

আমাদের ব্যক্তিগত শক্তি সমূহকে যখন সহযোগিতার মধ্য দিয়া আমরা সমবেত করতে পারব—তখন আমাদের বস্তুর সম্বলও একই সমবায়ে মিলিত হয়ে আমাদের বস্তুর অভাব ঘুচিয়ে দেবে। এইরূপ আর্থিক সহযোগিতার উপরেই আমাদের এই সব প্রতিষ্ঠান-গুলির ভিত্তিস্থাপনা করতে হবে। ইহা যে শুধু আমাদের শিক্ষা দান করবে তা' নয়—এ আমাদের মধ্যে সজীব হয়ে থাকবে—এযে শুধু-চিন্তা করবে তা নয়—এ সৃষ্টি করবে। আমাদের তপোবন আমাদের দেশের স্বাভাবিক বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল সেই তপোবন, জীবন বর্জ্জিত ছিল না। সেখানে গুরু ও শিষ্য উভয়েই সম্পূর্ণভাবে বাস করত—তারা ফল এবং ইন্ধন আহরণ করত—তারা গোচারণে যেত—তাদের চারিদিকে যে একটী আধ্যাত্মিক সত্তা বিরাজ করত তাই থেকেই তারা তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করত। আমা-দের এই কেন্দ্রগুলি শুধু যে মানসিক অনুশীলনের কেন্দ্র হবে তা নয়—তারা আমাদের ব্যবহারিক জীবনেরও কেন্দ্র হবে। নিজেদের ভরণ পোষণের তরে এখানের অধিবাসীরা ভূমি কর্ষণ করবে, গো পালন করবে। এরা বিজ্ঞানের সাহায্যে নব নব যন্ত্র তন্ত্রের আবিষ্কার করে নিজেদের যাবতীয় অভাব মোচনের ব্যবস্থা করবে। এইরূপ যৌথ প্রণালীতে পরিচালিত শিল্প-প্রচেষ্টার সফলতার উপরেই ইহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করবে। এইরূপে গুরু শিষ্যের মধ্যে একটী দায়িত্বের যোগ সূত্র গঠিত হয়ে উঠবে। এ

থেকে আমরা যে শিল্প শিক্ষা লাভ কর্‌ব তার মধ্যে লাভের লালসার কলঙ্ক থাক্‌বে না।

এই বিদ্যালয় গুলি তাদের সন্নিহিত গ্রাম সকলকে একত্রিত করে নানারূপ ব্যবহারিক অনুষ্ঠানের সজীব যোগসূত্রে আপনাদিগের সহিত যুক্ত করে নেবে। গ্রামবাসিদের বাসস্থান নির্ম্মাণ, তাদের স্বাস্থ্যরক্ষা তাদের নৈতিক এবং মানসিক উন্নতি সাধন প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারেও তারা লিপ্ত হবে! এক কথায় এদের ধরিত্রীর মত সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন—আত্মপোষণ ক্ষম এবং স্বাধীন হতে হবে উল্কার মত গ্রহ বিশেষের বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশের মত হলে চল্‌বে না। চির নূতন জীবনের দ্বারা ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে এরা এদের প্রতিভার জ্যোতিকে দেশে দেশে কালে কালে ব্যাপ্ত কর্‌তে থাক্‌বে—এরা নিজেদের চতুর্দিক থেকে শক্তি এবং উপাদান আহরণ করে এমন একটি গ্রহমণ্ডলের সৃষ্টি করবে যার অন্তরে মানুষ সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং মানসিক ব্যবহারিক এবং সামাজিক উন্নতির মধ্য দিয়ে অবশেষে আধ্যাত্মিক মুক্তির মধ্যে উত্তীর্ণ হবে।

১৮-শ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আমি আমাদের এই শিক্ষা কেন্দ্রকে বিশ্বভারতী নামে অভিহিত করতে চাই। এখনও একটা বিষয়ের আলোচনা করতে বাকি আছে। সেই আলোচ্য বিষয়টা এই যে এই বিশ্বভারতীতে

কোন ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হবে। যাকে আমরা সাধারনতঃ জাতীয় শিক্ষা বলি তার আলোচনায় আমরা এই বিষয়টীকে এড়িয়ে চলে থাকি। আমরা জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়কে হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই নামান্তর বলে বুঝি। অতএব এ বিষয়ে চিন্তা কর্‌তে গেলেই হিন্দু ধর্ম্ম আমাদের মনে উদিত হয়। আমরা অখণ্ড ভারতের ধারণা কর্‌তে পারি না বলেই ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থা কর্‌তে গিয়েও আমরা তাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখি।

সে যাই হোক একথা স্বীকার কর্‌তেই হবে যে জগতে বিচিত্র ধর্ম্মমত আছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাক্‌বে। এ নিয়ে আক্ষেপ অথবা বিবাদ কর্‌লে চল্‌বে না। আমার ঘরের কোণে আমার ছোট টেবেলটীতে যে সব কালী-কলম, কাগজ পত্র আছে তা আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই—সেখানে আমি যা' ইচ্ছা কর্‌তে পারি। এখানে আমার বন্ধু বান্ধবদের স্থান দিতে না পারলেও আমার লজ্জিত হবার কারণ নাই। এই কোণটী খুব সঙ্কীর্ণ হতে পারে—এ' বদ্ধ এবং অপরিষ্কার হতে পারে—এর তরে আমার ডাক্তার বন্ধু আমাকে তিরস্কার কর্‌তে পারেন—আমার আত্মীয় স্বজন আপত্তি কর্‌তে পারেন এবং শত্রুপক্ষ উপহাস করতে পারেন—কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের আদৌ সাদৃশ্য নাই। আমার কথা হচ্ছে এই যে যদি আমার বাড়ীর মধ্যে সকল ঘরই আমার বিশেষ সুবিধার তরেই তৈয়ারী করা হয় যদি সেখানে বন্ধু বান্ধবদের অভ্যর্থনা কর্‌বার এবং অতিথিদের আসন দেবার যোগ্য স্থান না থাকে তাহলে আমি যে অপরাধী এবং এরূপ অবস্থা যে বড়ই লজ্জার বিষয় এ কথা স্বীকার কর্‌তেই হবে। সেখানে

এই ক্ষুদ্র আমি টুকুর সংকুলান হতে পারে কিন্তু সেখানে বন্ধু সম্মিলনের মত বৃহৎ ব্যাপারের স্থান নাই।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে সকল দেশেই এবং সকল কালেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়। পুরুষ পরম্পরাগত অভ্যাস-বশে এবং ব্যক্তিগত মেজাজ অনুযায়ী মানুষ বিশেষ বিশেষ সাম্প্রদায়িক সত্যের অনুসরণ করে' আত্মপ্রসাদ লাভ করে। যতক্ষণ তা ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে ততক্ষণ তত ক্ষতিকর হয় না। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে বিবাহ বিসম্বাদ হওয়া বাঞ্ছনীয় না হলেও অনিবার্য্য। এখন আমাদের দেখ্‌তে হবে আমরা এমন কোনও মিলনক্ষেত্র তৈয়ারী কর্‌তে পারি কিনা যেখানে এই সব অনিবার্য্য সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ অতিক্রম করে ভেদাভেদ বিস্মৃত হয়ে পরিপূর্ণ ঐক্যের মধ্যে সহজ ও সরল সম্বন্ধে মিলিত হতে পারে। ভারতের ধর্ম্মব্যবহার মধ্যে কি এমন কোনও ঠাঁই নাই যেখানে বিশ্বমানব সবাই দিনের আলো এবং মুক্ত বাতাস লাভ কর্‌তে পারে? সাম্প্রদায়িক গোঁড়ারা যে ভাবে শিরসঞ্চালন করে তা' দেখ্‌লে হতাশ না হয়ে থাক্‌তে পারা যায় না—এবং সাম্প্রদায়িক মতামত নিয়ে ধর্ম্মের নামে দুনিয়ায় যে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে থাকে তা দেখ্‌লেও এইরূপ মিলনক্ষেত্রের সম্ভাবনার সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও যখন আমি ভারতের সেই বিশুদ্ধ বৈদগ্ধ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি—যে যুগের ভারত সত্যের মধ্যে উন্নত হয়েছিল তখন সেখানে সেই বৈদগ্ধ্যের মধ্যেই যে এই মিলনক্ষেত্রের সম্ভাবনা নিহিত আছে এ কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর্‌তে আমার সাহস হয়। আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণ তাদের সভ্যতার মধ্যে এমন একটী

উদার আসন বিছিয়েছিলেন যেখানে সমস্ত বিশ্বমানব এক মিত্রতার আসন গ্রহণ কর্‌ত। সেখানে কলহ ছিল না। কেননা যিনি সকল বিরোধের মধ্যে শান্তিরক্ষা করে আছেন সেই শান্ত—যিনি সকল বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন সেই অদ্বিতীয় পুরুষের নামেই তারা বিশ্বের কাছে তাদের আহ্বানবাণী প্রেরণ করেছিলেন। এবং তারই নামে প্রাচীন ভারতে এই চিরন্তন সত্য-বাণীটী ঘোষিত হয়েছিল যথা:—আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু য পশ্যতি সঃ পশ্যতি অর্থাৎ সকল ভূতকেই যিনি আত্মবৎ দেখেন তারই দেখা সত্য দেখা।

শ্রীঅমূল্যরতন প্রামানিক।

সমাপ্ত।

স্বর্ণ বনাম লৌহ

আমরা সাধারণতঃ আবশ্যক ও অনাবশ্যকের মধ্যে যে পার্থক্যের কসি টানি, সেটা প্রায় ঠিক জায়গায় পড়ে না। আমাদের মনের কোন বিশেষ ঝোঁকে এই কসিটা অনেক সময় বেঁকে চুরে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তাই অনাবশ্যকের হিসাবে এমন সব জিনিষ বাতিল হয় যে গুলোকে ফেলে আবশ্যকের হিসাবটা সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়ার মত ঠিক না হোক, তবু যা' বেঁধে রাখি তা' লোহার চেয়ে বড় বেশী মূল্যবান নয়।

বাজারের ভাষায় মূল্য শব্দটা ব্যবহার করলাম বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ শব্দটার যেন একটু অসুবিধা আছে। কারণ এই মূল্যের মানদণ্ড নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক উঠতে পারে। স্বর্ণকারের নিকষে লোহা অপেক্ষা সোনার দর যে ঢের বেশী, এ ত সকলেই জানে ও মানে। অতি বড় বোকা ব্যবসাদার বা বরকর্ত্তাও বিশ ভরি সোনার বদলে বিশ সের কেন, সময় বিশেষে বিশ মণ লোহা নিতেও গররাজি হবেন। কিন্তু তা হলেও ছেলেদের নীতি কবিতায় যখন আমরা স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদের বিষয় পড়ি, তখন কাকে যে উচ্চ আসনে দেব, এ নিয়ে সহসা যেন একটা মন্তব্য ঠিক করে উঠতে পারি নে।

যাই হোক, বর্ত্তমানে আমরা কিন্তু লোহাকেই বড় বেশী মাথায় তুলছি। প্রতীচ্য যুগ নির্ণয়ে এটা নাকি হচ্ছে Iron age. সেই

জন্যেই কি লোহার কদর এত বেড়ে যাচ্ছে? আমাদের প্রাচ্য যুগাবতারের বর্ণনাতেও বলা হয়েছে—'কলয়সি করবালং'। এখানেও লৌহেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। অবতার হলেও কল্কিদেবের হাতে জয়দেব অবশ্য সোনার খাঁড়া দেন নি। তা যদি দিয়ে থাকেন, তবে এটাও তাঁর বর্ণনান্তরে কমলের দ্বারা ভুঙ্গ দলনের মত একটু বেখাপ্পা হয়েই দাঁড়ায়। ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কল্কিদেব যদি লোহা ফেলে সোনার অসি ধারণ করেন, তবে জগতের লোক মৃদুহাস্যে আমাদেরই কবিতার ভাষায় বলতে পারে—'হেমময় কাটারি, কামে নাহি আওয়ল, উপরহি ঝকমকি সার'।

এই সব যুগ-লক্ষণের সঙ্গে লৌহের প্রভাবের সম্পর্ক বুঝি আর না বুঝি, অয়সের আধুনিক আদর বুঝতে আমাদের আর বড় বেশী আয়াস পেতে হয় না। কালা আদমির উপর পৃথিবীর নেক নজর না পড়ুক, কিন্তু এই কালো ধাতুটির প্রতি দেখছি, কম বেশী সকল জাতিরই মন আকৃষ্ট হয়েছে। অন্য ক্ষেত্রে সাদার সঙ্গে কালোর গরমিল থাকলেও, এ ক্ষেত্রে সাদায় কালোয় একেবারে যেন হরিহর-আত্মা। ধর্‌তে গেলে শ্বেতের দেশই এই ধাতুগত কৃষ্ণ পূজার প্রতিষ্ঠা ভূমি। লৌহ এখানে ছোট বড় নানা বিগ্রহ ধারণ করে কর্ম্মক্ষেত্রের প্রায় সবটাই অধিকার করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার চিন্তা ক্ষেত্র, এমন কি ধর্ম্ম ক্ষেত্রের উপরও চড়াও হতে ছাড়ে নি। জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে এটি বিভিন্ন রকমে দেখা দিলেও আসল কাঠামর বেলা এর সঙ্গে অন্য খাদ বড় কিছু মেশে না।

এখন পাশ্চাত্য সমাজ যন্ত্রের চালক ত Industrialism। এর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সবই যে লোহা দিয়েই গড়া। এ বিরাট কল

কারখানার রূপ ধরে প্রতি নিয়তই বিদ্যুৎগতিতে সমাজকে ঘোরাচ্ছে ও ছোটাচ্ছে। এর প্রবল তাড়নায় মানুষ যে দু-দণ্ড একটু সুস্থির হবে, তার জোটি নেই। সুস্থির হবে কি, এর ঘূর্ণায়মান চক্রে একটু শৈথিল্য ঘটলেই, চারিদিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে যে অমনি সমাজের কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়! উর্দ্ধশ্বাসে ছোটো, নয় পেছনের ধাক্কায় পথের ধুলায় লোটো, এই হল হাল সভ্যতার সার কথা বা motto।

সমাজের নীতি যেখানে এমন দুর্দ্দান্ত, সেখানে রাষ্ট্রের বেলা যে সেটি শান্ত হবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা। বরং এই রাষ্ট্রনীতির লৌহময় দেহযন্ত্র যে আরও ভীষণ তাণ্ডবে মেতে উঠবে, এইটিই ত স্বাভাবিক। তাই এই নীতির বর্ত্তমান আত্মা Militarism এর সংস্পর্শে এর স্থূল শরীর—কামানের ধ্বংসলীলা—এমন প্রচণ্ড ভাব ধারণ করেছে। বলা বাহুল্য এই নবীন militarism ও সেই প্রাচীন মহম্মদীয় খড়্গনীতি—অবশ্য এক জাতীয়ঃ নয়। কারণ সে প্রাচীন নীতির মন্ত্র ছিল "লা এলাহি এল্লেলা।" তার ভিতরকার তাড়না ছিল ধর্ম্মের উন্মাদনা। কিন্তু আধুনিক নীতির হুঙ্কার হচ্ছে "ময় ভুখা হুঁ।" লেলিহান রসনা মেলে এ নিয়তই শীকার খুঁজে ফিরছে, এর করাল গ্রাসের কাছে কারও নিস্তার নেই। হাজার খেলেও এর পেট ভরবার নয়, হাজার পেলেও এর আশা পুরিবার নয়। এর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার কিছুতেই তৃপ্তি নেই—হবিষা কৃষ্ণ-বর্ত্মের কেবলই বেড়ে উঠছে।

কলকারখানার প্রতিযোগিতার সংঘর্ষে ভিন্ন জাতির মধ্যে যে ভাবের ফুলকি ঠিকরে ওঠে, সেটিকে অবশ্য আর মৈত্রী বলা

চলে না। হাজার মোলায়েম বার্ণিস লাগালেও, এর আসল রূপ হিংসা ও বিদ্বেষ ছাড়া আর বড় কিছু নয়। তা হলেও, কেবল রূপকের ভাষাতেই এই সংঘর্ষজাত ভাবটিকে অগ্নির সহিত তুলনা করা যেতে পারে। অন্তরে ধিকি ধিকি জ্বললেও, এটি বাহিরে প্রকাশ পেতে একটু লজ্জা বোধ করে। কিন্তু militarismএর আগুণ নকল রূপক ছেড়ে আসল রূপের মধ্যেই স্বপ্রকাশ। এর নিজের যেমন প্রকাশে কোন কুণ্ঠা নেই, এর স্পর্শেও তেমনই হাতে হাতেই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি। হিংসা অনল হলেও নিজেই পোড়ে, অপরকে পোড়াতে পারে না। কিন্তু কামানের গোলা নিজেও পোড়ে, সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও ভস্মসাৎ করে।

পাশ্চাত্য মঙ্গলবাদীরা এই সব কঠোর নীতিকে একটু নাকি সংযত করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই সব লৌহ-ভীম চূর্ণ করবার মত কোন ধৃতরাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছে কি? অনেকে মনে করেন এরা কারও শক্তিতে দমিত হবার নয়। এরা সময়ে নিজেরাই নিজের আগুণে পুড়ে তবে নিঃশেষ হবে। সুরোন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল যদুবংশ যেরূপে ধ্বংশ হয়েছিল, militarismএর বংশও একদিন সেইরূপ লুপ্ত হবে। অবশ্য যদুবংশের তুলনায় এ বংশ হয়ত সহস্রগুণে বিপুল ও বলশালী, কিন্তু তেমনই এর উচ্ছৃঙ্খলতা আর মত্ততাও যে লক্ষগুণ প্রবল। বিগত যুদ্ধে এর এই আত্মবিনাশের নাকি নিদর্শন পাওয়া গেছে। কিন্তু এই রক্তবীজের ঝাড় অবশ্য এখনও উজাড় হয় নি।

এই পথ ও পাথেয়ের সুবিধার দিনে কোন জিনিষই আর তার নিজের দেশেই আবদ্ধ থাকে না। জড় রাজ্যেরই হোক, আর

ভাবরাজ্যেরইহোক, প্রায় সব জিনিষই এখন আমদানি রপ্তানির মুখে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছাড়িয়ে পড়ে। তাই যে সব নীতির বিষয় উল্লেখ করছিলাম, তাদের উদ্ভব শ্বেতের দেশে হলেও বাকি রংয়ের দেশগুলোকেও তারা তাদের রঙ্গভূমি করে তোলবার চেষ্টায় আছে। অনেক পাশ্চাত্য সমালোচকের মতে পীতের দেশে নাকি এদের সকলেরই আদর খুব বেড়ে উঠেছে। তবে আবার অনেক খাঁটি পীতাঙ্গ এটা বড় স্বীকার করেন না। এঁরা বলেন য়ুরোপ যে জাপানকে militarism এর আড্ডা বলে প্রচার করে, সেটা নিতান্ত গাজুরি দোষারোপ। জাপানে বাস্তবিক militarism এর নাম গন্ধ নেই, যা আছে, সেটা হচ্ছে military preparedness আত্মরক্ষার জন্য পীতাঙ্গ এই প্রস্তুতির ভাবটিকে অক্ষুন্ন রাখতে বাধ্য।

যাই হোক, আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের—বিশেষতঃ মানোয়ারী জাহাজের—খবর রাখবার আমাদের কোন প্রয়োজনই নেই। Militarismই বল, আর military preparednessই বল, এ সব ঝঞ্ঝাট থেকে বিধাতা আমাদের বহুদিন ধরে মুক্ত রেখে দিয়েছেন। এ সব দুশ্চিন্তার ভার অপরের ঘাড়ে পড়ায় আমাদের নিবিড় নিদ্রাভোগের কোনই ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা নেই। তবে কামানরূপী militarism এর দোহাই পাড়বার মতিভ্রম আমাদের স্পর্শ করতে না পারলেও, মেসিনরূপী Industrialism এর হাত থেকে রেহাই পাবার মত আত্মসম্ভ্রম দেখাব, এতটা আশা আজকার দিনে করা যে যায় না। স্বীকার করি আমাদের কাছে সোনার সম্মান বিশেষরূপেই আছে। এ সম্মান কমা দূরে থাক্ আগের চেয়ে আরও যে বেশ চড়েছে, এমন কথাও নির্ব্বিরোধে বলতে পারা যায়।

নরনারীর যে সম্বন্ধটা সমাজের পত্তন ভূমি, সেটা এখন নির্ণীত হয় সুবর্ণের চুক্তিতে। এখন আমাদের কলেজি যুবার একগণ্ডে বিদ্যার ছাপ আর অপরগণ্ডে তার সুবর্ণ মূল্য কষে পারিনয়িক বাজারে লট্‌কে দেওয়া হয়। শুনেছি আগে দুষ্কৃতকারীদের মুখেই এমনই করে চূণ-কালি মাখিয়ে প্রকাশ্য স্থানে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল। উপমাটা তেমন বুঝি প্রীতিকর হল না। প্রীতিকর না হলেও একথা অসত্য বা অসঙ্গত নয়। বিদ্যার ছাপটা যখন সরস্বতীর হাতের মার্কা, তখন সেটা whitewash এর চেয়ে বড় বেশী অন্তর্মুখী না হলেও সাদা ত বটেই, কিন্তু তার পাশে ঐ অসুর তেজে শ্বশুরদলনের প্রবৃত্তিটাকে আলকাতরার পোঁচ বল্‌লে কি বেজায় কিছু বলা হয়? ফলকথা, আমাদের কুলমর্য্যাদা, গুরু পুরোহিত তন্ত্র মন্ত্র নিয়ে যতই আমরা আধ্যাত্মিক গৌরবে ফুলে উঠি না কেন, এ ক্ষেত্রে স্বর্ণই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা নিয়ন্তা।

কিন্তু আমরা এই প্রসঙ্গে যে লোহার কথা তুলেছি, তার সঙ্গে ত এ সোনার কোন বিরোধ নেই। বরং এই সোনাকে লাভ করবার জন্যই যে লোহার এই প্রাণপণ উদ্যম। বিরাট মেসিনগুলি ঘুরে ঘুরে চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'র নির্ব্বেদের মন্ত্র আওড়াচ্ছে কি? তারা বিপুল শক্তিতে জগতের স্বর্ণরাশি নিজের অধিকারে কেন্দ্রীভূত করবারই চেষ্টা করছে। কামানের গোলার মানুষের আত্মাকে পুরাতন জীর্ণ বাস ছাড়াচ্ছে বটে, কিন্তু তার নিজের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই অনেককেলে পুরাতন barbaric pearls and gold। তাই বলেছি এ দিক দিয়ে লোহার সঙ্গে সোনার কোন বিবাদ ত নেইই, বরং সোনাই হচ্ছে এখানে লোহার অভীপ্সিত লক্ষ্য।

তবে এ ছাড়া সোনার যে আর একটা দিক আছে। বাজারের হিসাবে সে দিক দিয়ে সোনার কিছুই গৌরব নেই। সেটা হচ্ছে অবশ্য সোনার মূল্যের দিক নয়, সৌন্দর্য্যের দিক। শুধু এ হিসাবে সোনা অনাবশ্যক অকেজো, সুতরাং অনেকের মতে হয়ত বস্তু-তন্ত্রতাহীন। সোনা যখন কোন কম্বুগ্রীয়ায় লম্বিত হয়, তখন সেটাতে দুই হিসাব জড়িয়ে থাকে বলেই তার এতটা কদর। এক হিসাবে সেটা সৌন্দর্য্যের পরিবর্দ্ধক ত বটেই কিন্তু অন্য হিসাবে সেটিকে বন্ধক রেখে ফুটো গেরস্থালিতে একটু তালি দেওয়াও চলে। এখানে সোনা হচ্ছে চাঁপা নয়, সজ্‌নের ফুল। ইচ্ছা করলে মালা করে পরা যায়, আবার ইচ্ছা কর্‌লে দিব্যি ভেজেও খাওয়া যায়। বিধাতা এই ফুলটির ভিতর দুইটি হিসাব রেখেছেন বলে বোধ হয় এর কোন দিকটাই তেমন খোলেনি, মালার হিসাবে এ নগন্য, তরকারির হিসাবেও উচ্চ দরের নয়।

বলা বাহুল্য সোনার এই অকেজো দিকটাই হ'ল তার নিজস্ব, তার কেজো দিকটার প্রতিষ্ঠা করেছে মানুষ। সৌন্দর্য্যই তার আসল ঐশ্বর্য্য, অন্য ঐশ্বর্য্য সে যা লাভ করেছে সেটা নির্ণীত হয়েছে বাজারের নিক্তিতে। পৃথিবীর কাজের লোকেরা তার এই নিক্তির কাঁটার পানেই এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অন্য দিকে এরা ভ্রূক্ষেপই করে না। তবু পৃথিবীতে এখন অকেজো লোকও অনেক জন্মায়, যারা এই অকেজো দিকটার মহিমা কীর্ত্তন করে থাকে। সোনা বোধ হয় জড়রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য বলে, ভাব রাজ্যের সৌন্দর্য্যেরও প্রতীকরূপে প্রায় সর্ব্বত্রই পরিগণিত। এই প্রতীকের ভাষায় সুন্দরের ব্যাখ্যান সব দেশের ধর্ম্ম, সাহিত্য দর্শনে দেখতে

পাওয়া যায়। তবে এখন অবশ্য নিদারুণ কেজো লৌহনীতির তাড়নায় সুন্দর অনেক জায়গায় খুবই যেন কোণঠাসা হয়ে পড়্‌ছে।

আমাদের দেশে এই অকেজো সৌন্দর্য্যের মহিমা বিশেষ ভাবেই কীর্ত্তিত হয়েছে। ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন কোন ক্ষেত্রেই ইহা অনাদৃত হয় নি। এই বর্ত্তমান খাঁটি লৌহযুগেও এখানে ঐ সোনার গৌরবের কথা এখনও শুনতে পাওয়া যায়, এখানকার শ্রেষ্ঠ কবি সৌন্দর্য্যের গান গেয়ে শুধু এ দেশকেই নয়, যে দেশের লৌহচক্রের আরাবে আর সব সুর ডুবে যাবার উপক্রম, সেখানকারই ভাবুক বিবুধমণ্ডলীকে এতটা মুগ্ধ করেছেন যে, তাঁরা কবিকে বিজয়টীকা না পরিয়ে থাক্‌তে পারেন নি। তাঁর স্থূল শরীরটা লোহার জাহাজে সমুদ্র যাত্রা করলেও তাঁর অন্তর রাজ্যে সোনার তরী সোনার ধানে পূর্ণ হয়ে চিরদিনই রইবে। আর তাঁর ক্ষেপাও যেখানে আকাশ সোনার বর্ণ সমুদ্রগলিত স্বর্ণ, পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন,' সেখানে যার গুণে সব জিনিষ সোনা হয়ে যায়, তারই সন্ধানে চিরদিনই ফিরবে। এমন অদ্বিতীয় কবির কথা ছেড়ে দিলেও এখানকার সাধারণ লোকের মধ্যেও এই স্বর্ণের সম্মান এখনও কিছু আছে বলেই মনে হয়। ভাবুক যাত্রাওয়ালাও তার যাত্রার সুরে সেদিনও গেয়েছিল—কবে পরশমণি করিয়ে স্পর্শন, এই লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন।

তা বলে লৌহযন্ত্রের গর্জ্জন এখানেও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আর এই গর্জ্জন যে দিন দিন বাড়্‌তে থাক্‌বে এও অবশ্যম্ভাবী। ভারতমাতার অজস্র স্নেহরসে অভিষিক্ত হয়ে পূর্ব্বে আমাদের সোনার স্বপন দেখবার খুবই সুযোগ ছিল। কিন্তু পুরাকালে হিমালয়কে বৎস পরিকল্পনা করে ধরিত্রীকে যেমন দোহন করা হয়েছিল, তার চেয়েও

প্রচণ্ড দোহন এখন এই ভারতভূমিকে সহ্য করতে হচ্ছে। রপ্তানির মোহানা দিয়ে এর সঞ্চিত রস চারিদিকে হুহু করে বেয়ে চলেছে। তার ফলে আমাদের অন্নচিন্তা যতই চমৎকার হয়ে উঠ্‌ছে, আমাদের অন্নচিন্তার বহরও সেই সঙ্গে কমে আসছে কি?

আমাদের চিন্তাশীল দেশ হিতৈষীরা এই অন্ন সমস্যার সমাধান করতে দেশের মনকে পাশ্চাত্য লোহালক্কড়ের দিকে টানছেন। তাঁদের এ ব্যবস্থা দেশকে গ্রহণ করতেই হবে। বিদেশী হলেও কল কারখানাকে বরণ করে ঘরে না তুল্‌লে চল্‌বে না। এই লৌহ-যুগে কলকে বর্জ্জন করা অসম্ভব। শুধু মাটি কামড়ে পড়ে থাক্‌লে আর উদর পোরে কৈ? পৃথিবীর বণ্টননামায় এই মাটির রস আমাদের ভাগ্যে যে ক্রমেই 'চটকস্য মাংসং' হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা ছাড়া আমাদের রুচিত্ত ত আর আগের মত সাদাসিধে রকমের নেই আধুনিক বৈচিত্র নইলে আর যে মন ওঠে না। এইরূপ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানা কারণে আমরা হাজার রক্ষণশীল হলেও, বিদেশী লোহাকে আসন দিতে বাধ্য।

কিন্তু এই বাধ্যতা আসক্তিতে পরিণত হওয়া কি বাঞ্ছনীয়? যদি আমরা লোহাকেই সর্ব্বস্ব করে তুলি, আমাদের ধ্যানে জ্ঞানে কেবল লোহাই যদি জেগে থাকে, তবে আমাদের মনোজগৎ খাঁটি রকমে লৌহাত্মকই হয়ে পড়বে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—এতধরা কথা। কোন বিষয়ে তন্ময়তার গুণে যে আমরা সেই বিষয়ে রূপান্তরিত হয়ে যাই, এ Psychology এ দেশের দর্শনে অবিদিত নেই। "অনুক্ষণ মাধব মাধব সোঁয়রিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই" শুধু দর্শনের কঠোর যুক্তিতে নয়, কবিত্বের এই মধুর

ভাষাতেও এ সত্য সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। সুন্দরী যদি মাধবের শ্যামরূপ ভাবতে ভাবতে নিজেই মাধব হয়ে থাকেন, তবে আমাদের মনটাও লৌহের একান্ত—ধ্যান ধারণায় কেনই বা লৌহশ্যাম হয়ে পড়বে না?

এখন যদি লৌহের এই সাযুয্য ও সারূপ্য আমাদের অভীপ্সিত না হয়, তবে আমাদের মনের মধ্যে অন্য বিষয়ের ইপ্সার ও স্থান রাখতে হবে। দেশের মধ্যে কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ও যথাযথ উন্নতি—অবশ্য এখন নিতান্তই প্রয়োজন, কিন্তু তা বলে কোন বৈজ্ঞানিক দেশ-হিতৈষীও বোধ হয় কোন বৈজ্ঞনিক প্রক্রিয়ায় এই সমগ্র দেশের চিত্তকে magnet বা অয়স্কান্তে পরিণত করতে চাইবেন না। আর লোহা ছাড়া অন্য বিয়য়ের চিন্তাও আশা করি বৈজ্ঞানিকের কাছে আমাদের মস্তিষ্কের অপব্যবহার বলে পরিগণিত হবে না।

চিন্তার অপব্যবহার এখানে খুবই ঘটেছে। ভাবের চর্চ্চা অনেক ক্ষেত্রে শেষে Sentimentalism এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যের স্থাপনা হয়ত শেষে ন্যায়ের কচকাচিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সে জন্য ত ভাব ও ন্যায় মনুষ্যত্বের উপাদান থেকে বাতিল পড়তে পারে না। অপব্যবহার কোন্ জিনিষেরই বা ঘটতে না পারে? অতি বার্দ্ধক্যে ভীমরতি বা চিত্ত বিকৃতি জন্মায়। আমাদের অনেক জিনিষ আদিকালের বুড়ো বলে হয়ত একটু বিকৃত হবারই কথা। কিন্তু আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের বিকার এরই মধ্যে যে বেজায় বেড়ে গেল। মানুষের স্বাস্থ ও সুবিধার বিধানই ছিল রসায়ণের বৈজ্ঞানিক না হোক পার্থিব উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই রসায়ন এই তরুণ

বয়সে বিকারের ঘোরে সম্প্রতি কি ভয়ঙ্কর রকমই না বিষ ও বিস্ফোরক উদ্গীরণ করলে!

প্রবীণেরই হোক, আর নবীনেরই হোক, কারও বিকার অবশ্যই মঙ্গলপ্রদ নয়। প্রবীণের বিকার যদি ঘটে থাকে তবে তার সংশোধনের পথ দেখাই দরকার। বয়োবৃদ্ধ বলে তার দেহে Hypodermic syrynge বসাতে ইতস্ততঃ না করাই উচিত। কিন্তু সুস্থ অথচ বিকারপ্রবণ নবীনের বেলা অবশ্যই Prevention is better than cure। আমাদের সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দরের যুগে সৌন্দর্য্য বুদ্ধির যে বিকৃতি ঘটেছিল, বর্ত্তমানে সেটা সংশোধিত হয়েছে। যোগের তুরীয় ভাব যদি সাধু সন্ন্যাসীর ত্বরিতানন্দে পর্য্যবসিত হয়ে থাকে তবে সেটার নিরসন অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে বিপুল কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করতে আমরা কোমর বাঁধছি, তার ফলে আমাদের দেশের মনোজগৎকে কেবল নিভাজ ও নিরেট তড়িতানন্দেই যেন না পেয়ে বসে, সে বিষয়েও সাবধান হওয়া চাই নাকি? অবশ্য তড়িতের প্রবাহে আমাদের সুস্থ মনে নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করবে আমাদের অচল বাহু নতুন বলে বলীয়ান হবে, আমাদের সংকীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রের আর সীমা পরিসীমা থাকবে না। আমাদের জড়ভরত মৈনাক আবার হয়ত পাখা মেলে অনন্ত আকাশ চিরে ছুটবে। আমাদের প্রণত বিন্ধ্যগিরি আবার হয় ত দুর্দ্ধর্ষ বেগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। দেশের নদী নালা খাল বিল নানা আকারের পণ্য পোতে ঝঞ্ঝাতরঙ্গের মত চঞ্চল হয়ে পড়বে। দেশের দিকে আকাশ মেসিন ও কামানের ধোঁয়ায় একদিন হয়ত গাঢ় মসীময় মূর্ত্তি ধারণ করবে। চাকার গোঙানি, হুইসেলের ফোঁপানি,

তার সঙ্গে হয়ত বারুদেরও গজরানি মিশে দেশের বাতাসটাকে তোলপাড় করে তুলবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও খিতোন জীবনটা বিচিত্র কর্ম্মের মন্থন দণ্ডে ঘোরালো হতে থাকবে।

তা হলে আবার সাবধানতার কথা কেন? যে বস্তুর স্পর্শে এমন সঞ্জীবনী শক্তি নিহিত, তার অভ্যর্থনায় আবার কোন রকম দ্বিধার অবসর কোথায়? অন্য যা কিছু সব সরিয়ে ফেলে কেবল এই বস্তুটিকেই আমাদের দেশে এখন প্রতিষ্ঠিত করা বিধেয়। কিন্তু গোলযোগ এইখানেই। এই নতুন আমদানিটির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অবশ্যই কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু এই সরিয়ে ফেলার কাজটা নিয়ে একটু কথা আছে বৈ কি। এটিকে স্থান দেবার জন্যে আমাদের সরিয়ে ফেলার মত কিছুই নেই, এমনটা বললে বড়ই গাজুরী দেখান হয়। তা হলেও এটির আসলের আয়তন এতটা বাড়তে দেওয়া কখনই উচিত নয়, যাতে আমরা আমাদের আর যা কিছু সবই বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হব। আমরা তড়িতের বাণে ত্বরিতানন্দের তুরীয়তা নিশ্চয়ই নির্ব্বিরোধেও ঝাড়াতে ও তাড়াতে পারি, কিন্তু সেই সঙ্গে চিরতাপস হিমালয়েরও যদি যোগ ভঙ্গ করতে চাই, তবে সেই বান ঠিকরে পড়ে আমাদের গৌরবময় স্বরূপত্ব নিশ্চয়ই ধ্বংস করবে। চিরদিন মাথা হেঁট করে থেকে বিন্ধ্যাচলের যদি অবনতি ঘটে থাকে, সেটা নিরাকৃত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তার প্রণতির ভিতর যে ভক্তির ভাবটুক বিদ্যমান আছে, সেটির নিরসন তড়িতের চঞ্চল ঔদ্ধত্যে নিশ্চয়ই পূর্ণ হবার নয়।

মোট কথা মানুষের জীবন শুধু লোহা দিয়ে গড়লে চলবে না, আবার শুধু সোনা দিয়ে মুড়লেও খাটবে না। স্থূলতঃ দেখতে

গেলে আমরা শুধু লোহার সাহায্যেই প্রাণ ধারণ করতে পারি। কিন্তু কেবল প্রাণ ধারণ করা অন্য জীবের লক্ষ্য হলেও, মানুষের ত তা নয়। মানুষ যদি এই লক্ষ্য ধরে থাকত, তবে সে অন্য জীব থেকে এমন একটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পারত না। অপর প্রাণীর উপযোগী সাধারণ প্রবৃত্তি ছাড়া মানুষের ভিতর অসাধারণ প্রকৃতি আছে বলেই, তার অনুশীলনে মানুষ তার এই বর্ত্তমান মনুষ্যত্ব লাভ করেছে। এই মনুষ্যত্বকে যদি তাকে রক্ষা ও বর্দ্ধন করতে হয়, তবে শুধু তাকে তার এই অন্নময় জীবনটার শোভা সম্পদের দিকে নজর দিলেই চলবে না, এর সঙ্গে তার অনন্দময় জীবনেরও ঔৎকর্ষ সাধন করতেই হবে। ফলে জীবনটাকে শুধু বিশ্বকর্ম্মার কামারশাল করে তুল্লে চলবে না, সেখানে সারস্বত-আশ্রমও চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকা চাই।

অবশ্য নৈমিষারণ্য বা উজ্জয়িনীর যুগ একেবারেই চলে গেছে। তাকে আবার টেনে আনা গঙ্গাকে গোমুখীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতই অসম্ভব। আমরা এই মোহ নয় লৌহমুদ্গর মুখর যুগের মধ্যে অতীতের শান্ত রসটিকে যদি পূর্ণরূপে স্থাপন করতে চাই, তবে সেটি শীঘ্রই হাপরের আগুনে ফুটে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। কিন্তু তা হলেও আমাদের অন্তরের নিভৃত কন্দরে সেই রসটির জন্য যথেষ্ট স্থান রাখতে হবে, নইলে মুগুর ও হাপরের পাল্লায় পড়ে আমাদের শ্রান্ত ও শুষ্ক হৃদয়ে পিপাসার যে অবধি থাকবে না। দেশটাকে নৈমিষারণ্য করা অসম্ভব বলে সেটাকে বার্লিন বা বারমিংহাম করে তুলতে হবে, এমন কি কথা আছে? এমনটা করলে যদি চতুর্ব্বর্গ ফল পাওয়া যেত, তা হলেও বা সেই চেষ্টার একটা সার্থকতা থাকত।

কিন্তু ঐ ফলের চারটে দূরে থাক, এই দারুণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তার নিকৃষ্ট—আর্দ্ধকটাও পাওয়া যখন দুষ্কর, তখন এই দেশটাকে সাত সমুদ্র তের নদী পারের মুল্লুকে রূপান্তরিত করতে যাওয়ায় ত কোনই ফয়দা নেই। তবে হয়ত অনেক কেজো অর্থ কামবাদী লোক ধর্ম্ম মোক্ষকে অকেজো বলে বাতিল করতে চাইবেন।

এঁদের মতে শুধু এ দুটো কেন, যে-সব জিনিষ মানুষের খাওয়া পরা ও সুখ সুবিধার কাজে লাগে না সে সবই অনাবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশে এখন অনেক নামজাদা Realist আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা Moses বা Christ, Shakespeare বা Milton, Kant বা Hegel-এর কোনই প্রয়োজনীয়তা দেখতে পান না। এঁরা সকলেই যে স্থূলবুদ্ধি ও সংকীর্ণচেতা তা অবশ্য নয়। এঁদের অনেকের হৃদয়ে প্রগাঢ় জন-হিতৈষণাও আছে। তবে একটা কথা জানতে ইচ্ছা হয়, এই যে দেশ ও জন নেতার প্রবৃত্তি এঁরা লাভ করেছেন কোথা হতে? যদি সৃষ্টির আদি থেকে শুধু কেজো জড়তত্ত্বেরই চর্চ্চা হতে থাকত, তবে মানুষের প্রতি মানুষের এই প্রীতি ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি এমন করে উন্মেষিত ও উদ্বোধিত হত কি? প্রীতি ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি আত্মতত্ত্বের অনুশীলন ছাড়া, (তা আত্মা জিনিষটা গোড়ায় যাই হোক না কেন,) জন্মাতে পারে বলে ত মনে হয় না। বিজ্ঞান যেমন জড়তত্ত্বের, ধর্ম্ম, সাহিত্য দর্শন তেমনই আত্মতত্ত্বের অনুশীলনেরই ফল। এ ফলটি বাদ দিলে মানুষের জীবন যে কতটা নিষ্ফল হয়ে পড়ত, সেটা এখন আমরা হয়ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নে। আমরা মুখে এই আত্মতত্ত্বের আবশ্যকতা মানি আর না মানি, এর অনুশীলনের ফলগুলি মানুষের প্রকৃতির মধ্যে জড়িয়ে আছে

বলেই মানুষ প্রকৃত মানুষ। এই ফলগুলির অভাবে মানুষের বর্ত্তমান মনুষ্যত্ব যে কত পরিমাণে খর্ব্ব হত তার ইয়ত্তাই হয় না। এখন এগুলিকে অকেজো বলে অনাদর করলে, মানুষ যে সিঁড়ি দিয়ে এতটা উঁচুতে উঠেছে, সেটাকে পায়ে ঠেলে দূরে ফেলা হয়।

অবশ্য আমরা এখানে কোন জাতি বিশেষের কথা বলছি না। সকল জাতির পক্ষেই এই লৌহ ও স্বর্ণের সামঞ্জস্য রক্ষা করা চাই। তবে এ সামঞ্জস্য অবশ্য সকলের পক্ষেই এক রকমের হবে না—সেরূপ সার্ব্বভৌমিক সামঞ্জস্য সময় এখনও ত আসে নি। এখন প্রত্যেক জাতি তার বিশেষত্বের দ্বারাই এই সামঞ্জস্য ঠিক করে নেবে।

অন্য দেশে এই সামঞ্জস্যের হানি ঘট্‌লেও, আমাদের মধ্যে কি এর সেরূপ কোন আধুনিক ব্যত্যয় দেখা দিয়েছে, যার জন্যে এত কথা পাড়্‌বার বিশেষ আবশ্যকতা আছে? সত্যই আমাদের শিক্ষা দিক্ষা সংস্কার কি লৌহময় হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে? না হলেও হবার যে খুবই সম্ভাবনা। আর এর একটু আধটু নিদর্শনও যে দেখা যাচ্ছে না, তাও নয়। আমাদের দেহটা আমাদের দেশের রসে পুষ্ট হলেও আমাদের মানস-তরু শিকড় দিয়ে ততটা নয়, যতটা পাতা দিয়ে বাতাস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে। আর এই বাতাসটা যে বেশীর ভাগই পশ্চিমে এ বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই। এখন এই পশ্চিমের বাতাসের সঙ্গে ভূমির নানা উপাদান উড়ে এসে এ দেশে জুড়ে বসেছে। সেখানকার ফুলের পরাগের সঙ্গে অনেক ধূলো মাটিও এসে জমছে, আর আমাদের দেশ এই আমদানির ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষেই বুক পেতে নিচ্ছে। বিদেশী হলেও ঐ পরাগের আদর

যদি এ দেশ করে থাকে, এমন কি দেশের চিন্তার কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের হাতে যদি এরূপ পরাগের সাহায্যে একটা hybridised রকমের সুন্দর ফলের উদ্ভব হয়ে থাকে, তার জন্যে কোন আক্ষেপ নেই। কারণ এ দেশের মস্তিষ্ক যে আধুনিক সভ্য দেশের মস্তিষ্কের তুলনায় কিছুতেই নিকৃষ্ট নয়, এইটিই প্রকাশ পেয়েছে। বিজ্ঞান আত্মসাৎ করবার এ দেশের যথেষ্ট শক্তি আছে বলেই, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখানে আদৃত হয়েছে। সাহিত্য শিল্পকলায় এ দেশের বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই দেশের বিশেষজ্ঞেরা এমন ভাবে স্বদেশী ও বিদেশী মশলার মিশ্রণে দেশের বর্ত্তমান সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করতে পেরেছেন।

কিন্তু ধূলা ও ধোঁয়ার বেলা? এর মধ্যে পড়ে যে অনেকেরই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটছে। কেউ ঐ পশ্চিমের ধূলোটাকে বোধ হয় শোভন পাউডার ভেবে আমাদের সমাজের মুখে লাগিয়ে তাকে সাদা করে তুল্‌তে চাচ্ছেন। কেউ ঐ ধোঁয়ার মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আভা দেখে সেইটাকেই আমাদের উদ্ধারের আলো বলে ঠিক করে বস্‌ছেন। কবিত্বের রিনিঝিনি, দর্শনের ঘটত্ব-পটত্ব, ধর্ম্মের নাকে কাঁদুনি এ সব অপ্রাকৃত ও অপদার্থ সখের জিনিষ শিকেয় তুলে রেখে সেরেফ প্রকৃত-পদার্থ-সাগরে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই, জোর গলার এমন মন্তব্যও বেশ শুন্‌তে পাচ্ছি। এই সাগর মন্থন করেই আমরা অমৃত ও লক্ষ্মী লাভ করব, এই এঁদের ধারণা। যদি পৈতৃক প্রাণটাকে রক্ষা করতে চাও তবে আর সব ফেলে শুধু এই পদার্থামৃত পান করে, পদার্থলক্ষ্মীর ভজনা কর। জান ত Survival of the fittest, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, এই হল জগতের নীতি।

এখন fittest কে? না যে মেরে-ধরে কেড়ে-কুড়ে নিজের কোলের দিকে অপরের চেয়ে বেশী ঝোল সংগ্রহ করতে সমর্থ। কিন্তু সৃষ্টির আদিতে যদি এ নীতি চলে থাকে, মানুষ কি বরাবরই এ নাগাদ এই নীতির অনুসরণ করছে? পশুজগতে বাঘ-ভাল্লুক যে হিসাবে যোগ্যতম, মানুষের মধ্যে মানুষ চিরদিনই কি সেই হিসাবে যোগ্যতম? আঁচড়া আঁচড়ি, কামড়া কামড়ির দক্ষতাই কি মানুষেরও যোগ্যতমতার একমাত্র নিদর্শন? এর ভিতর কিছু সত্য থাকলেও, এটিকে কি মানুষের ষোলআনা সত্য বলা যায়? মানুষের ভিতর পশু যে আছে, একথা মানতেই হবে, কিন্তু পশুত্ব বর্দ্ধনের নয় দমনের আদর্শই, মানুষ যুগে যুগে প্রচার করে আসছে। আর এই প্রচারের সঙ্গে তার আচারকেও নিয়মিত করতে মানুষ কি কঠোর সাধনা করেনি? না সে সাধনায় মানুষ একেবারেই সিদ্ধ হয় নি?

লৌহ নীতির একান্ত প্রবর্ত্তনে মানুষের এই সাধনা ও সিদ্ধি ক্রমে যে একেবারেই বিলুপ্ত হবে, এ আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। যতদিন এই নীতির উপর মানুষের অভ্যস্ত সাধনার প্রভাব থাকবে, ততদিন মনুষ্যত্ব চার পা হঠেও এক পা এগোবে, কিন্তু যখন অনুশীলনের অভাবে ঐ প্রভাব একেবারে উঠে যাবে, তখনই হবে তার কামড়া কামড়ির পূর্ণ আদর্শের স্থাপনা। অর্থাৎ তখন মনুষ্যত্ব ও ব্যাঘ্রত্ব এ দুটো প্রায় Synonymous বা সমানার্থক হয়ে দাঁড়াবে। শিবিরাজা যে কপোতটির জন্য নিজের দেহ দান করেছিলেন, সেটা হবে নিছক বেহদ্দ বোকামি। কিন্তু যে ব্যাঘ্রবাহাদুর ছলে বলে অপরের প্রাপ্যটা ষোলআনা নিজে দখল করে বসলেন, তাঁরই

প্রশংসার তুমুল হাততালিতে চারিদিক আমূল আলোকিত হয়ে উঠ্‌বে।

ভাল লৌহের প্রভাবকে সংযত রাখবার জন্যে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায় কি স্বর্ণের উপাদান একেবারেই বাদ পড়েছে? বিদেশী হলেও এ শিক্ষায় কি আত্মতত্ত্বের চর্চ্চার কোনই ব্যবস্থা করা হয় নি? দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা বৈদশিক, সুতরাং তাতে আত্মার অশনের একান্তই অভাব এতটা বল্‌লে হয়ত সত্য প্রিয়তার অপেক্ষা স্বাদেশীকতার বেশী পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু খাদ্য থাকলেও আমাদের অন্তরের মধ্যে যে সেটা যথাযথ রকমে assimilated হচ্ছে না, এ কথা ত না মেনে থাকা যায় না। এই শিক্ষার প্রবর্ত্তনে আমরা যে দু দশজন মানুষের মত মানুষ পাচ্ছিনা, অবশ্য তা নয়। তবে এই দু দশজনকে দেখে শিক্ষার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হতে পারে না। কারণ এই দু দশজনের ভিতর এমন অসাধারণ প্রতিভা থাকতে পারে, যাতে তাঁদের আত্মা সমস্ত প্রতিকূল ব্যবস্থা ও অবস্থা অতিক্রম করে বিকশিত ও বিবর্দ্ধিত হতে সমর্থ। বিদেশী বলে দেশের রস ও মাটির সঙ্গে এর তেমন যোগ না থাকাতে এ শিক্ষার ফসল বড় সামান্য হয়ে দাড়াচ্ছে। তা ছাড়া অনেকে এর পদ্ধতিরও অনেক দোষত্রুটি বার করছেন। ফলে শত করা বিরানব্বই কি নিরানব্বই জন শিক্ষার্থীর বেলা এই নূতন বিদ্যাটা আত্মার পুষ্টিকর রসে পরিণত না হয়ে, কবির ভাষায় কাগজের পিণ্ডির মতই খস্‌খস্‌ গজ্‌ গজ্‌ করছে।

তাই বর্ত্তমান শিক্ষায় সোনার উপাদান থাকলেও, তাতে শিক্ষার্থীর অন্তরাত্মা একটুও স্বর্ণঘটিত হচ্ছে না, তার উপরে পড়ছে মাত্র একটা গিল্টির ছাপ। সুতরাং স্বর্ণ ও লৌহের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে

এখানে লৌহের প্রাবল্য ঘটবার খুবই সম্ভাবনা, কারণ ও গিল্টির ছাপ একটু আগুণ ও জলের সংস্পর্শেই যে বিশীর্ণ ও বিবর্ণ হয়ে পড়্‌বে। আবার এর মধ্যে আরও একটু কথা আছে। যেটুকু সোনা এই গিল্টির কোটিংয়ে পাওয়া যায়, তারও যে গৌরব সৌন্দর্য্যের হিসাবে বড় একটা দেখা হয় না, চাকরির বাজার দরেই যে তার মূল্য নির্নীত হয়। কি উপায়ে শিক্ষাকে সুব্যবস্থিত করা যায়, কেমন করে এর দোষত্রুটির সংশোধন হয়, কোন্ আদর্শের অনুসরণে আমাদের শিক্ষার্থীদের চিত্তে এই শিক্ষার প্রতি যথার্থ অনুরাগ জন্মাতে পারে, এ সব গভীর বিষয়ের আলোচনা করতে গেলে হয়ত ছোট মুখে বড় কথা বলা হবে। তবে ছোট মুখে বড় কথা বলার অধিকার যখন এ যুগে বেশ প্রবল, এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তখন এ সম্বন্ধে দু দশটা মন্তব্য পেশ করাও না হয় যেত। কিন্তু শিক্ষার আদর্শের ব্যাখ্যান ত এ প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয়। যে লৌহঘটিত শিক্ষা দিন দিন আমাদের দেশে পসার জমাচ্ছে, চারিদিকের আবেষ্টনের পরিবর্ত্তনে ও প্রভাবে যেটির পসার আরও বিশেষরূপে জমা অবশ্যম্ভাবী, সেটি স্বর্ণঘটিত শিক্ষাকে একেবারে অভিভূত না করে ফেলে, এই টুকুই বল্‌তে চাইছি। আর এমন কথা পাড়াটাও বোধ হয় কল্পিত প্রতিপক্ষ ভেবে Quoxotic রকমে শূন্যের উপর লাটি মারাও নয়। কারণ আমরা বড়ই যে এক ঝোঁকে চলি। বিদেশের দিকে যখন ঝুঁকি, তখন স্বদেশে যে ভাল কিছু আছে, এটা আমাদের মনেই আসে না। আবার স্বদেশের দিকে যখন ঝুঁকি, তখন একেবারে ধ্রুব সিদ্ধান্ত করে ফেলি, যা নেই ভারতে তা নেই জগতে। প্রথম ঝোঁকের বশে আমাদের চোখে এ দেশের

অতীত ঠেকে একেবারে ধূ ধূ সাহারার মতই ফাঁকা, পাল্টা ঝোঁকে সেই অতীতকে সমগ্র জগতে ভূত, ভবিষ্যত বর্ত্তমানের যা কিছু ছিল, আছে বা হতে পারে সমস্ত দিয়ে যেন নস্যান তিল ধারণের মত ভরাট করে তুলি। তাই মনে হয় লোহা যখন আমাদের শিক্ষার ঘাড়ে এসে চেপেছে এবং আরও চাপতে থাকবেই, তখন এই চাপুনির ঝোঁকে সোনাটিকে অবহেলা করা আমাদের পক্ষে বড় অসম্ভব নয়।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাব অন্তর্মুখী না হয়ে বড় বেশী যে বহির্মুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর আর একটা নিদর্শন খুব বিশেষরূপই যেন আমাদের মধ্যে প্রকট। আসল বস্তুটি অপেক্ষা তার নামের উপর এই যে একটা বিকারগ্রস্ত বিদ্‌ঘুটে টান, এটাকে অবশ্যই শিক্ষার প্রতি যথার্থ অনুরাগ বা পূর্ব্বরাগ কিছুই বলা যায় না। এ যেন মাথা ছেড়ে টেরি বা টিকিকেই সর্ব্বস্ব করে তোলা। টেরি বা টিকির উপর কারও অসঙ্গত বিরাগ থাকা অবশ্যই ঠিক নয়, বরং ওদের সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করতেও সকলেই পারেন। তবে কি না ওদের নীচে একটা সম্মান ও সম্বর্দ্ধনার যোগ্য মাথা ত থাকা চাই। পাঁকের উপর থাকলেও পদ্মের আদর কমে না বটে, কিন্তু পদ্মের এ আদর পাঁকের Symbol-এর হিসাবে ত নয়। মূল্য নিরূপণে Symbol-এর হিসাব ছাড়া আর কোন কথাই থাক্‌তে পারে না, সেগুলি যদি Substance-এর প্রাপ্য সম্মান দাবি করে, তবে Substance ও Symbol দুইটাই যে খোলা হয়ে পড়ে। মাথার ঝুঁটি প্রাচ্যভাবে পেছন দিকেই ঝুলুক, প্রতীচ্যভাবে সমুখ দিকেই হেলুক, তার নিজের যা কিছু মূল্য সেটা ত মাথার মূল্যের দ্বারাই নির্ণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা না হয়ে ঐ ঝুঁটিটাই যদি বড়

বেশী কাম্য ও মূল্যবান হয়ে ওঠে, তাতে মাথার সম্মানের হানি ত ঘটেই, ঝুঁটিরও সম্মান, আসলে হয়ে দাঁড়ায় নিতান্তই ঝুটা। বর্ত্তমানে এই যে বস্তুর চেয়ে নামের, কায়ার চেয়ে ছায়ার, মাথার চেয়ে ঝুঁটির সম্বর্দ্ধনার মত আমাদের একান্ত উপাধিগত বাতিক, এটা নিশ্চয়ই শিক্ষার স্বাস্থ্যের নয়, ব্যাধিরই লক্ষণ।

সম্প্রতি এই বেয়াড়া বাতিকটা আমরা বুঝি একটু কমাতে শিখছি, কিন্তু এ শিক্ষাটা ঠিক একটা সুসঙ্গত মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ শেখাটা যেন কতক' ঠেকে শেখা। ব্যবসা বানিজ্য বা ঐরূপ কোন ব্যাপারে ঠেকে শেখা অবশ্য মন্দ নয় কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঠেকে শেখা কিংবা দেখে শেখা দুটোর কোন টাকেই তেমন উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না। কারণ এ দুটো অনেক সময় বেশ খাটলেও, Culture-এর বেলা এদের খাটানো কখনই সঙ্গত নয়। শেষোক্তর বেলা নিজের অনুভূতির দ্বারা বুঝে শেখাই অবশ্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ঝুঁটির দর কমেছে বলেই আমরা তার উপর কতকটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি। মাথা বা আসল Substance-এর প্রতি আমাদের সম্মানবুদ্ধি বর্দ্ধনের ফলে ঝুঁটি বা Symbolটির পসারের এই হ্রাসটুকু ত ঘটেনি। তবে কি আমরা যথার্থ Culture সম্বন্ধে কিছুই জানি না, না বলি না? জানি না এ কথা অবশ্য ঠিক নয়, তবে কি না, জেনেও মানি না। আর এর সম্বন্ধে আমরা বলেও থাকি অনেক, কিন্তু সেটাও অনেকটা আওড়ানো বুলির মত। কারণ এই বুলির সঙ্গে আমাদের কাজের মিল খুবই কম থাকে। Symbol এর সম্মান কমলেও Substance সম্বন্ধে মুখে যাই বলিনা কেন, কাজে Symbol-কেই মাথায় করে রাখি। মোট কথা এ দিক

দিয়ে, আমরা যে স্বর্ণঘটিত শিক্ষার কথা বলছিলাম, তার প্রতি আমাদের যথার্থ অনুরাগ ত প্রকাশ পায়ই না, বরং ঔদাসীন্যই লক্ষিত হয়।

যাই হোক, মানব সভ্যতাকে পূর্ণাঙ্গ রাখতে হলে, এই স্বর্ণ ও লৌহ—দুইয়েরই দাবি আমাদের গ্রাহ্য করা চাই। শুধু মতে বা আদর্শে নয়, ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে। জাতীয় জীবনে এই দুই রকম শিক্ষা ওতপ্রোত ভাবেই মিশে থাকা দরকার। প্রত্যেক ব্যক্তিও যাতে ঐ দুইরূপ শিক্ষা কিছু না কিছু লাভ করে, এইটিই সামাজিক সুব্যবস্থা। তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যে ঐ দুইরূপ শিক্ষার মধ্যে সমান ভাবে গড়ে উঠবে, এমন আশা করা প্রায় বিড়ম্বনা। একাধারে সরস্বতী ও বিশ্বকর্ম্মার বরপুত্র কেউ হতে পারে না। মস্তিষ্ক ও মুগুরের চালনায় সমান দক্ষতা লাভ করা, শুধু অনেকেরই নয়, সকলের পক্ষেই অসম্ভব। এমন সাধক বোধহয় কোথাও মিলবে না, যিনি সাধনার বলে ব্রাহ্মণত্ব ও বৈশ্যত্ব দুইই পুরোদস্তুর লাভ করতে সমর্থ।

সমগ্র পৃথিবীটাকে জাতি হিসাবে ভাগ করে অনেকেই ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মণের কোটায় ফেলে থাকেন। স্বদেশী কি বিদেশী কোন অভিজ্ঞ লোকই তার এই গৌরবের দাবি অস্বীকার করবেন না। কিন্তু এই পুরানো গৌরবের জের বজায় রাখতে হলে, বর্ত্তমানেও তার সেই ব্রাহ্মণত্ব কিছু বজায় রাখা চাই নাকি? জানি তার পক্ষে সেই অনায়াস বা অল্প আয়াস লভ্য অসন বসনে দৈনিক—ব্যাপার সম্পন্ন করে এখন আর আগের মত একান্ত অসম্ভব। এখন তপোবনের যজ্ঞাগ্নির চেয়ে গৃহের জঠরাগ্নির আহুতি জোগাতেই

যেন দেশটা বিষম বিব্রত। এখন হোমের ধোঁয়ায় ব্যোমের দেবতার তৃপ্তি সাধন রেখে নিজের উদর তৃপ্তির জন্য উনুনের ধোঁয়া জাগায়ে রাখাই হয়েছে দেশের একটা জটিল সমস্যা। কিন্তু তবুও তার এই সসীম দেহ ও উনুনের ভাবনার মধ্যেও ঐ অসীম মন ও ব্যোমের দিকেও তাকে নজর দিতে হবে, নইলে তার ব্রাহ্মণত্ব শুধু অতীতের বড়াইয়ের কড়াইভাজা চিবিয়ে কখনই বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ঠ থাকবে না।

জাতীয়ত্বের সংরক্ষণেই হোক, আর ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণেই হোক, ব্রাহ্মণ-স্বর্ণ-শিক্ষা ও বৈশ্য-লৌহশিক্ষার মিলন দেশ ও কাল নির্ব্বিশেষেই একান্ত প্রয়োজন। এই দুই শিক্ষার মিলন ও সামঞ্জস্যের উপরেই যে মনুষত্ব নির্ভর করে, এটা খুব একটা তর্ক বা সন্দেহের বিষয় বলেই মনে হয় না। কি ধ্যানস্থ দার্শনিক, কি একনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, উভয়েই এটা বেশ স্বচ্ছন্দেই মেনে নিতে পারেন। এই দুইটা শিক্ষার মধ্যে কোনটা বেশী দরকারী, সে তুলনার কোন দরকার নেই। তবে এ দুটির মধ্যে যেটির সঙ্গে আমাদের উদরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেটিতে অবশ্য কর্ম্মেরই প্রাধান্য। বলা বাহুল্য কর্ম্ম শব্দটা এখানে দার্শনিক নয়, সাধারণ সামাজিক অর্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে। সমাজ যখন সুশৃঙ্খল থাকে, তখন অবশ্য সকলকেই এই কর্ম্মগত শিক্ষার জন্যে চেষ্টা পেতে হয় না, অনেকে শুধু জ্ঞানগত শিক্ষা লাভ করবার একান্ত ভাবেই অবসর পায়। তবে সামাজিক বিশৃঙ্খলায় যখন জীবিকা-বিভ্রাট ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠে, তখন শেষোক্ত শ্রেণীর লোকগুলিকে খানিকটা পাততাড়ি গুটিয়ে অন্ন-সমস্যার সমাধানেও লাগতে হয়। তখন

সমাজের ব্রাহ্মণত্ব কমে গিয়ে বৈশ্যত্ব বাড়তে থাকে। কিন্তু কি অনুকুল কি প্রতিকুল অবস্থায়, সমাজে স্বর্ণঘটিত ব্রাহ্মণ-শিক্ষার একটা বিশিষ্ট স্থান রাখতেই হবে, নইলে কর্ম্মের চাপে জ্ঞান বেচারী চিড়ে চেপটা হয়ে অসাড় ভাবেই পড়ে থাকবে।

দুইটি শিক্ষার শ্রেষ্ঠতাগত তুলনা না করেও এটা বেশ বলতে পারা যায় যে, সমাজের কোন অবস্থায় vocational training বা কর্ম্মগত শিক্ষা অনেকের পক্ষে তেমন প্রয়োজনীয় না হলেও, সব সময়ে সকল শিক্ষার্থীর পক্ষেই cultural training বা জ্ঞানার্জ্জনী শিক্ষার একটা সুব্যবস্থা থাকাই উচিত। কারণ প্রবৃত্তি বা অবস্থার তাড়নায় সমাজে কর্ম্মের চাঞ্চল্য অতিরিক্ত রকম বাড়লেও, ভাব ও জ্ঞান সেটিকে সঙ্গত ভাবে চালিত করে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে। তখন এই চাঞ্চল্য উদ্দাম উন্মাদনায়, ন্যায় ও ধর্ম্ম দলিত করে, দিক বিদিকে ছোটে না। ব্যক্তিগত জীবনে, ধর্ম্মের প্রভাব সে ত আরও উঁচু কথা, শুধু এই culture-ই অনেকেরই অনেক মঙ্গল সাধন করতে সমর্থ। নিজের কর্ম্মগত গণ্ডীর অবরোধের মধ্যে যে একটা আবদ্ধ সংকীর্ণতা জন্মায়, culture-এর খোলা হাওয়ায় সেটা অনেকাংশে অপসারিত হয়ে থাকে। সাফল্যের গর্ব্বকে সংযত, ব্যর্থতার অবসাদকে লঘু, অবসরের আমোদকে অনাবিল, উত্তেজনার আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে এর প্রভাব ত নিতান্ত কম নয়। সম্পদে ও বিপদে সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতগুলো Culture যে বেশ শোভন ও সহনীয় করে তুলতে পারে, এ কে না স্বীকার করবে? আমাদের সঙ্কটময় সংসার পথের এমন বন্ধুটিকে কি কর্ম্মী কি ধর্ম্মী, কি জ্ঞানী

কি গুণী সকলেরই যে বিশেষ আদর করা কর্ত্তব্য, এতে আর সন্দেহ কি।

তাই যাঁরা জ্ঞানপ্রধান স্বর্ণ শিক্ষার অনুসরণ করছেন, শুধু তাঁদেরই এটি দরকার তা ত নয়, যাঁরা কর্ম্ম-প্রধান লৌহ শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে অবলম্বন করেছেন, তাঁদেরও এর কিছু না কিছু চর্চ্চা রাখা চাই কিন্তু এই শেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর পক্ষে Culture-এর যৎকিঞ্চিৎ চর্চ্চটুকু যদি নিতান্ত অনুগ্রহের ভাবেই ব্যবস্থিত হয়, তবে সে অনুগ্রহটা বেনামি নিগ্রহ থেকে বড় বেশী বিভিন্ন হবে না। অর্থাৎ মুগুর ও বাটালিতে হাত জোড়া আছে বলে যদি Culture এর দুই একখানা পাতা অবহেলায় পায়ে চেপে তার দিকে কখন একটু কৃপাকটাক্ষ মাত্র ফেলা হয়, তবে সেরূপ চর্চ্চার প্রবর্ত্তন অপেক্ষা নিবর্ত্তনই শ্রেয়ঃ। শুধু এটি কেন, সব রকম চর্চ্চাই প্রকৃত শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া কেবল যে বাঞ্ছনীয়তা নয়, একান্তই প্রয়োজনীয়। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং—এ সারবান বচনটি কখন obsolete বা রদ্দীবাতীল হবার নয়।

শ্রীদয়াল চন্দ্র ঘোষ।

সিদ্ধি

—:*:—

১

স্বর্গের অধিকারে মানুষ বাধা পাবে না এই তার পণ। তাই কঠিন সন্ধানে অমর হবার মন্ত্র সে শিখে নিয়েচে। এখন একলা বনের মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধনা করে।

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নি মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আঁচলে করে তার জন্যে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝরণার জল।

ক্রমে তপস্যা এত কঠোর হল যে, ফল সে আর ছোঁয় না, পাখীতে এসে ঠুকরে খেয়ে যায়।

আরো কিছু দিন গেল। তখন ঝরনার জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে যায়, মুখে ওঠে না।

কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, "এখন আমি করব কি? আমার সেবা যে বৃথা হতে চল্‌ল।"

তারপর থেকে ফুল তুলে সে তপস্বীর পায়ের কাছে রেখে' যায়, তপস্বী জান্‌তেও পারে না।

মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রখর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে' ধরে' ছায়া করে' দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তপস্বীর কাছে রোদও যা ছায়াও তা।

কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যখন ঘন হয় কাঠকুড়নি সেখানে জেগে বসে থাকে। তাপসের কোন ভয়ের কারণ নেই তবু সে পাহারা দেয়।

২

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নির সঙ্গে দেখা হ'লে নবীন তপস্বী স্নেহ করে জিজ্ঞাসা করত, "কেমন আছ?"

কাঠকুড়নি বল্‌ত, "আমার ভালই কি আর মন্দই কি? কিন্তু তোমাকে দেখবার লোক কি কেউ নেই? তোমার মা? তোমার বোন?"

সে বলত, "আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে হবে কি? তারা কি আমায় চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পার্‌বে?"

কাঠকুড়নি বল্‌ত, "প্রাণ থাকে না বলেই ত প্রাণের জন্যে এত দরদ।"

তাপস বল্‌ত, "আমি খুঁজি চিরদিন বাঁচবার পথ। মানুষকে আমি অমর কর্‌ব।"

এই বলে' সে কত কি বলে যেত, তার নিজের সঙ্গে নিজের কথা, সে কথার মানে বুঝবে কে?

কাঠকুড়নি বুঝত না, কিন্তু আকাশে নব মেঘের ডাকে ময়ূরীর যেমন হয় তেমনি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

তার পরে আরো কিছুদিন যায়। তপস্বী মৌন হয়ে এল, মেয়েকে কোনো কথা বলে না।

তার পরে আরো কিছু দিন যায়। তপস্বীর চোখ বুজে এল, মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখে না।

মেয়ের মনে হল সে আর ঐ তাপসের মাঝখানে যেন তপস্যার লক্ষযোজন ক্রোশের দূরত্ব। হাজার হাজার বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পার হয়ে একটুখানি কাছে আসবার আশা নেই।

তা নাইবা রইল আশা। তবু ওর কান্না আসে, মনে মনে বলে, দিনে একবার যদি বলেন, কেমন আছ, তাহলে সেই কথাটুকুতে দিন কেটে যায়, একবেলা যদি একটু ফল আর জল গ্রহণ করেন তাহলে অন্নজল ওর নিজের মুখে রোচে।

৩

এদিকে ইন্দ্রলোকে খবর পৌঁছল, মানুষ মর্ত্ত্যকে লঙ্ঘন করে' স্বর্গ পেতে চায়—এত বড় স্পর্দ্ধা!

ইন্দ্র প্রকাশ্যে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন। বল্‌লেন, "দৈত্য স্বর্গ জয় করতে চেয়েছিল বাহুবলে, তার সঙ্গে লড়াই চলেছিল, মানুষ স্বর্গ নিতে চায় দুঃখের বলে, তার কাছে কি হার মানতে হবে?"

মেনকাকে মহেন্দ্র বল্‌লেন, "যাও তপস্যা ভঙ্গ করগে।"

মেনকা বল্‌লেন, "সুররাজ, স্বর্গের অস্ত্রে মর্ত্ত্যের মানুষকে যদি পরাস্ত করেন তবে তাতেও স্বর্গের পরাভব। মানবের মরণবাণ কি মানবীর হাতে নেই?"

ইন্দ্র বল্‌লেন, "সে কথা সত্য।"

৪

ফাল্গুন মাসে দক্ষিণ হওয়ার দোলা লাগ্‌তেই মর্ম্মরিত মাধবীলতা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তেমনি ঐ কঠকুড়নির উপরে একদিন নন্দন বনের হাওয়া এসে লাগ্‌ল। আর তার দেহ মন একটা কোন্

উৎসুক মাধুর্য্যের উন্মেষে উন্মেষে ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। তার মনের ভাবনাগুলি চাক-ছাড়া মৌমাছির মত উড়তে লাগ্‌ল, কোথা তারা মধুগন্ধ পেয়েচে।

ঠিক সেই সময়ে সাধনার একটা পালা শেষ হ'ল। এইবার তাকে যেতে হবে নির্জ্জন গিরিগুহায়। তাই সে চোখ মেলল।

সামনে দেখে সেই কাঠকুড়নি মেয়েটি খোঁপায় পরেচে একটি অশোকের মঞ্জরী, আর তার গায়ের কাপড়খানি কুসুম্ভ ফুলে রং-করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না। যেন সে এমন জানা সুর যার পদগুলি মনে পড়চে না। যেন সে এমন একটি ছবি যা-কেবল রেখায় টানা ছিল—চিত্রকর কোন্ খেয়ালে কখন এক সময়ে তাতে রং লাগিয়েচে।

তাপস আসন ছেড়ে উঠল। বল্‌লে, "আমি দূর দেশে যাব।"

কাঠকুড়নী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন প্রভু?"

তপস্বী বল্‌লে, "তপস্যা সম্পূর্ণ করবার জন্য।"

কাঠকুড়নি হাত জোড় করে বল্‌লে, "দর্শনের পুণ্য হতে আমাকে কেন বঞ্চিত করবে?"

তপস্বী আবার আসনে বসল, অনেকক্ষণ ভাবল, আর কিছু বল্‌ল না।

৫

তার অনুরোধ যেমনি রাখা হল অমনি মেয়েটির বুকের একধার থেকে আর একধারে বারে বারে যেন বজ্রসূচি বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল।

সে ভাব্‌লে, "আমি অতি সামান্য, তবু আমার কথায় কেন বাধা ঘটবে?"

সে রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে বসে তার নিজেকে নিজের ভয় করতে লাগল।

তার পরদিন সকালে সে ফল এনে দাঁড়াল, তাপস হাত পেতে নিলে। পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান করলে। সুখে তার মন ভরে উঠ্‌ল।

কিন্তু তার পরেই নদীর ধারে শিরীষ গাছের ছায়ায় তার চোখের জল আর থামতে চায় না। কি ভাব্‌লে কি জানি!

পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাপসকে প্রণাম করে বল্‌লে, "প্রভু, আশীর্ব্বাদ চাই।"

তপস্বী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

মেয়েটি বল্‌লে, "আমি বহুদূর দেশে যাব।"

তপস্বী বল্‌লে, যাও, "তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক্।"

৬

একদিন তপস্যা পূর্ণ হল।

ইন্দ্র এসে বল্‌লেন "স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ করেচ।"

তপস্বী বল্‌লে, "তা হলে আর স্বর্গে প্রয়োজন নেই।"

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও?"

তপস্বী বল্‌লে, "এই বনের কাঠকুড়নিকে।"

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বসন্তের বাণী।

—:*:—

শ্রীমান্ চিরকিশোর,

কল্যাণীয়েষু—

তুমি আমাকে বসন্তঋতুর উপর এমন একটি প্রবন্ধ রচনা কর্‌তে অনুরোধ করেছ, যার ভিতর পলিটিক্‌সের নামগন্ধও থাক্‌বে না।

ফরমায়েসটি শুনে আমি সেকেণ্ড খানেকের জন্য অবাক হ'য়ে গিয়েছিলুম। ঋতু বিশেষের সঙ্গে রাজনীতির যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে বা থাক্‌তে পারে এ ধারণা আমার ইতিপূর্ব্বে ছিল না। তার পর হুঁস হল যে তুমি ভেবে চিন্তেই আমাকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছ। এ বিশ্ব যেমন কবির কাছে নারীময়, বৈদান্তিকের কাছে ব্রহ্মময়, আজকাল আমাদের কাছেও তেম্‌নি পলিটিক্‌স-ময় হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমানে আমাদের পলিটিকাল আত্মা এতটা উত্তেজিত, উদ্বেজিত, উদ্বেলিত ও উদ্ভ্রান্ত হয়েছে যে, এ বিশ্বে যা কিছু আছে বা হচ্চে, তার মধ্যে পলিটিক্‌সের বিশ্বরূপ দেখা আমাদের পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়।

প্রকৃতির সাক্ষাৎকার-মাত্র লাভ করেই আমরা সন্তুষ্ট হই নে; উপরন্তু তার কথাও শুন্‌তে চাই। দার্শনিক প্রকৃতির মুখে শুন্‌তে পান তত্ত্বকথা, আর্টিষ্ট্ রূপের বারতা, কবি প্রেমের সঙ্গীত। প্রকৃতি যখন দার্শনিকের কাছে একখানি বিরাট ন্যায়সূত্র, কবির

কাছে মহাকাব্য, তখন পলিটিসিয়ানদের কাছে তা' যে হবে একখানি স্বরাট সংবাদপত্র তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তবে আমি যত বেয়াড়া পলিটিসিয়ানই হই নে কেন, প্রকৃতিকে ভগবানের লেখা সংবাদপত্র বলে স্বপ্নেও ভুল করি নি। ও রকম পর্ব্বত-প্রমাণ ভুল করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ এ বিশ্বাস আমার চিরকালই আছে—যে প্রকৃতির ভালমন্দ সকল কথাই সত্য আর সংবাদপত্রের ছোট বড় প্রায় সকল কথাই মিথ্যে। অতএব তুমি সতর্ক করে না দিলেও ফাল্গুনের বুকের ভিতর থেকে সিডিসান্ কিম্বা রাজভক্তি, এ দুয়ের কোনটিই সম্ভবত আমি টেনে বার কর্‌তে পার্‌তুম না।

(২)

আমি বলেছি যে প্রকৃতির ভাল মন্দ সকল কথাই সত্য; উপরন্তু ঋতুমাত্রেরই একটি বিশেষ বাণী আছে, অতএব বসন্তেরও কিছু বল্‌বার আছে। তবে সভ্য মানব নিজের কথা বল্‌তেই এত ব্যস্ত যে প্রকৃতির কথা শোন্‌বার তার আর অবসর নেই। আর যার অবসর আছে তার সে প্রবৃত্তি নেই; কেন না, আমরা ধরে নিয়েছি যে প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের আর কিছু শোন্‌বার কিম্বা শেখবার নেই। যার দিকে আমরা চেয়েই দেখি নে তার আবার কথা শুন্‌ব! প্রকৃতির দিকে যে আমরা দৃক্‌পাত করিনে, তার প্রমাণ বসন্তের বর্ণনা এ যুগে আমরা কর্‌তে পারিনে। আমাদের হাতের বর্ণনা হয় পূর্ব্বকবিদের বর্ণনার অনুকরণ, নয় অনুরণন। কলম হাতে কর্‌তেই আমরা ভুলে যাই, বঙ্‌লা-বসন্ত সংস্কৃত-বসন্তের অনুবাদও নয় অপভ্রংশও নয়। বাঙ্‌লার আর পাঁচটি নিজস্ব জিনিষের মত

বাঙ্‌লার বসন্ত ঋতুও যুগপৎ মৃদু ও ক্ষীণপ্রাণ। এ ভূভাগে বসন্ত কবে যে শীতের কাছ থেকে পৃথক হয়, আর কবে যে তা গ্রীষ্মের সঙ্গে মিলিত হয় সে দুই তারিখ কেউ বল্‌তে পার্‌বেন না। সে তারিখ যাঁরা নির্ণয় করেন তাঁরা, অর্থাৎ জ্যোতিষীরা আকাশের বিষয় সব জান্‌তে পারেন কিন্তু পৃথিবীর বিষয় কিছুই জানেন না। আকাশের তারা পঞ্জিকার শাসন মান্‌তে পারে কিন্তু মাটীর ফুল তা মানে না। এর কারণ জড় পদার্থ বাইরের নিয়মের অধীন, জীব কিন্তু একমাত্র স্বভাবের অধীন। তারপর, বাঙ্‌লা-বসন্তের পরমায়ুও অতি স্বল্প। একবার দেখা দিতে না দিতেই তা অন্তর্ধান হয়। বাঙ্‌লার বসন্ত, শীত ও গ্রীষ্মের ভিতর রঙিন কালির একটা 'হাইফেন' মাত্র। অপর পক্ষে সংস্কৃত যুগে বসন্ত ঋতু আর্য্যাবর্ত্তের বুকের ভিতর দিয়ে মন্দাকিনীর মত বয়ে যেত, তার এক কূল থাক্‌ত বরফের শ্বেত পাথর দিয়ে মোড়া আর এক কূল থাক্‌তো আকাশের অগ্নিবৃষ্টি দিয়ে পোড়া। আর সেই সুরসরিতে অবগাহন করে সে যুগের লোকে নবজীবন লাভ কর্‌ত। বসন্তের স্বরূপ তখন লোকের কাছে এতই প্রত্যক্ষ ছিল যে তারা অনায়াসে তার রূপবর্ণনা কর্‌তে পার্‌ত। এ যুগে বসন্ত, অন্ততঃ এ দেশে, প্রকৃতিবাদ অভিধানে আছে, প্রকৃতিতে নেই। এ সব কথা বলার উদ্দেশ্য যে বাঙ্‌লা বসন্তের বর্ণনা করা শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব যাঁর চোখে যা অতি সূক্ষ্ম তা'ও ধরা পড়ে আর যাঁর অন্তরে প্রবেশ লাভ করে' ক্ষণপ্রভাও চিরপ্রভা হয়। বলা বাহুল্য ইন্দ্রিয় মনের এতাদৃশ শক্তি কৌটিকের গোণ্ডুকের দেহে কালে ভদ্রে ভর করে। অতএব আমি যদি বসন্তের বর্ণনা কর্‌তে বসি, তাহলে সে বর্ণনা প্রথমত বই থেকে চুরি কর্‌তে হবে, তারপর

নানারূপ ধারকরা সাধুভাষার অত্যুক্তি দিয়ে সে চোরাই মালের গায়ে রঙ্‌ ফলাতে হবে।

বসন্তের দর্শন যে আমি পাইনে শুধু তাই নয়, তার স্পর্শনও আমার তেমন মেলে না। আজকের দিনের উত্তাপ কত, তা বল্‌তে হলে আমাকে খবরের কাগজের কাছে সন্ধান নিতে হয়। থার্ম্মমিটারের কৃপায় প্রকৃতির গায়ে হাত দিয়ে তার তরুণ জ্বরের মাত্রা আমাদের আর জান্‌তে হয় না; ফলে, তা জানবার শক্তিও আমরা হারিয়েছি। বিজ্ঞানের হাতে পড়ে যন্ত্র যেমন মানুষ হয়ে উঠেছে, মানুষও তেম্‌নি যন্ত্র হয়ে পড়ছে। এমন কি অনেকের মতে প্রাণের ধর্ম্ম ত্যাগ করে আমাদের পক্ষে জড়যন্ত্র হওয়াটাই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু বসন্তের দর্শন হচ্চে এ বিজ্ঞানের খণ্ডন।

(৩)

বসন্ত ঋতুর বর্ণনা যখন আমি কর্‌তে পারি নে, তখন তার ব্যাখ্যা কর্‌বার চেষ্টা করা যাক্‌। শীতের সমালোচনা কর্‌লেই বসন্তের আত্মার আমরা সাক্ষাৎকার লাভ কর্‌ব।

শীতের সর্ব্বাঙ্গে মৃত্যুর সকল লক্ষণই পাওয়া যায়। রক্ত তার জল, নাড়ী তার দড়ী, দেহ তার কাঠ। শিশির-ঋতু কিছুই অর্জ্জন কর্‌তে পারে না, তাই শুধু বর্জ্জনই করে। এ ঋতুতে গাছ যে মাথায় ফুল পরে না, কিন্তু তার গায়ের পাতা খসিয়ে ফেলে, তার কারণ, শীত-গ্রস্থ গাছ তার শিকড়ের নল দিয়ে পেট ভরে পৃথিবীর রস পান কর্‌তে পারে না, আর তার পাতার জিভ্‌ দিয়ে সানন্দে আকাশের আলো লেহন কর্‌তে পারে না। আর কায়ঃক্লেশে যেটুকু রস ও তেজ সে শোষণ ও চোষণ কর্‌তে পারে, সে টুকুও সে হয় মোটেই

জীর্ণ করতে পারে না, নয় একদম্ হজম করে বসে; ফলে উক্ত রস সে রক্তে, উক্ত তেজ সে বর্ণে রূপান্তরিত করতে পারে না।

শীতের চেহারায় একটা শান্ত ও সমাহিত ভাব আছে—কিন্তু সে শুধু স্থূলদর্শীর কাছে। সে-শান্তি তার নির্জ্জীবতার বাহ্যলক্ষণ, আর সে আত্মগত, ভাষান্তরে জড়-সড় ভাব, তার জড়তার নিদর্শন। আত্মগত হওয়ার অর্থ যদি হয় বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া, তা হ'লে ও অবস্থার যথার্থ নাম হচ্চে মৃত্যু। বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত থাকার নামই জীবন আর তা থেকে মুক্ত হবার নামই মৃত্যু।

বসন্তের ধর্ম্ম কিন্তু ঠিক্ এর বিপরীত। শীতের ধর্ম্ম হচ্ছে প্রাণকে জড়তার দিকে টেনে নামানো, আর বসন্তের ধর্ম্ম হচ্ছে জড়ের ভিতর থেকে প্রাণকে ফুটিয়ে তোলা। বসন্ত যে নবজীবনের যুগ, এ সত্য সকল দেশ সকল মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ ছিল। এই ঋতু তাই উৎসবের ঋতু, উপবাসের নয়। নবজীবনের একটা লক্ষণ হচ্চে তার বাইরের সঙ্গে, বহুর সঙ্গে মিলিত হবার কামনা। বসন্তে তাই আকাশের সঙ্গে পৃথিবীর, আলোর সঙ্গে বাতাসের, বর্ণের সঙ্গে গন্ধের, সলিলের সঙ্গে শব্দের এমন বিচিত্র, এমন অপূর্ব্ব মিলন ঘটে। বসন্তের উৎসব হচ্চে প্রকৃতির বিবাহ-উৎসব, কেননা, নবজীবনের সৃষ্টি করাই তার আসল কাজ। অতএব এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বসন্তের চরিত্রের নিন্দা সেই করতে পারে, যে একান্ত জড়বুদ্ধি। বসন্ত হচ্চে পত্র-পুষ্পে মণ্ডিত বহুবর্ণে বিচিত্র, মধুগন্ধে ভরপূর; তাই লোকে বলে—সে বিলাসী। অপর পক্ষে শীত হচ্ছে মুণ্ডিত-মস্তক নিরাভরণ বল্কলধারী ঋতু, তাই লোকে বলে সে উদাসী। কিন্তু এ বিলাস হচ্ছে প্রাণের বিলাস, আর ও ঔদাস্য

অ-প্রাণের অসাড়তা। এতক্ষণে তবে বলি বসন্তের কথার অর্থ আমি এই বুঝি, যে মানুষ অখিলের সঙ্গে সম্বন্ধ যত ত্যাগ করবে, তত সে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হবে, অপরপক্ষে সে অখিলের সঙ্গে যত বেশী সম্বন্ধ পাতাবে, আর সে সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ট করে তুলবে—তত সে প্রাণবন্ত হয়ে উঠ্‌বে। তবে যিনি প্রাণের তোয়াক্কা রাখেন না, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। আত্মহত্যা করবার অধিকারও ভগবান মানুষকে দিয়েছেন।

এতক্ষণ যা লিখ্‌লুম তার হয়ত কোনও মানে মোদ্দা নেই। যদি তা না থাকে'ত তার জন্যে দোষী লেখক নন। আজকের দিনে পলিটিক্‌স বাদ দিয়ে, যাই লেখা যাক্ না কেন, তার ভিতর অধিকাংশ পাঠক কোনও অর্থ খুঁজে পাবেন না। যে যুগে পলিটিক্‌স হচ্চে একমাত্র কাজের কথা, সে যুগে তদতিরিক্ত সকল কথাই অবশ্য বাজে কথা। কিন্তু কেউ যেন ভুলে না যান যে একমাত্র আমাদের পেটের হিসেব থেকে দেখলে, এ বিশ্বের বেশীর ভাগই বাজের কোঠায় পড়ে যায়। বসন্তে যে এত বেশী ফুল ফোটে, তা আমাদের কোন্ কাজে লাগে, এক শিমুলের ফুল ছাড়া? আর শিমুলের গাছেই বা ফুল ফোটার সার্থকতা কি? তার লাল ঘেরাটোপ বাদ দিয়ে একেবারে সাদা তুলো ফোটালেই ত অবিলম্বে আমরা তা চরকাস্থ করতে পারতুম। সকল গাছই যদি ডুমুরের গাছ হত, অর্থাৎ তারা যদি ফুল না ফুটিয়ে একেবারেই ফল ফলাত তা'হলে আমরা যে হাতে হাতে ফল লাভ করতুম তার আর সন্দেহ কি? ফুল ডিঙিয়ে ফল খাবার অদম্য প্রবৃত্তি যিনি আমাদের মনে দিয়েছেন, ফুল এড়িয়ে ফল গড়বার শক্তি তিনি প্রকৃতিকে দেন নি। এ অবশ্য নিতান্ত দুঃখের

বিষয়। কিন্তু এ অবিচারের জন্য দোষী স্বয়ং ভগবান। আর জানই ত এ অবিচারের কোন প্রতিকার নেই। ভগবানের বিরুদ্ধে আপিল চলে এক মানুষের কাছে। আর আমাদের মধ্যে যিনি যত বড় জজই হোন্ না কেন, তিনি সৃষ্টির বিরুদ্ধে রায় দিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতি তা execute কর্‌বে না। সৃষ্টির বিরুদ্ধে আমরা অবশ্য হয় বিদ্রোহ করতে পারি, নয় তার সঙ্গে non-co-operation করতে পারি; কিন্তু তাতেও কোন সুসার নেই। কেননা এ ক্ষেত্রে বিদ্রোহের ফল মৃত্যু আর non-co-operation এর ফল জরা।

অতএব দাঁড়াল এই যে বসন্তের বাণী শিরোধার্য্য করাতেই আমাদের পুরুষার্থ। ফুলের ভাষা যাঁরা বোঝেন, তাঁরা বসন্তের বিশ্ববিদ্যালয়ে এ জ্ঞান অনায়াসে অর্জ্জন করতে পারেন যে প্রাণের সুরে মন বাঁধাতেই মানবজীবনের সার্থকতা। আর সে সুর হচ্চে আনন্দের সুর। এ আনন্দ-ধ্বনি শুধু তাঁরই কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে না—যিনি তাঁর অন্তর ভরে রেখেছেন শুধু অভাবের বেদনা দিয়ে। অথচ এ কথাটা সকলেরই মনে রাখা শ্রেয়ঃ, যে এ বিশ্বকে মানুষ যখন তার অভাবের দিক্ দিয়ে দেখে, তখন সে হয়ে পড়ে তার দাস,—আর যখন মানুষ এ বিশ্বকে তার স্বভাবের দিক্ দিয়ে দেখে, তখন সে হয়ে ওঠে তার রাজা।

আর একটি কথা বলে এ চিঠি শেষ কর্‌ব। তুমি যখন আমাকে পলিটিক্‌স বাদ দিয়ে বসন্ত ব্যাখ্যান করতে বলো, তখন তুমি ঘুরিয়ে এই কথাটাই বলো, যে পলিটিক্‌সের আধ্যাত্মিকতা আমি বুঝি নে, অতএব আমার পক্ষে বসন্তের ঋতুর মত একটা পার্থিব ব্যাপারের আধিভৌতিক আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য আমি পালন

করেছি এই ভরসায় যে আমার এই বাজে কথারও কিছু মূল্য থাকতে পারে। গত দু'বৎসর ধরে দিনের পর দিন শত শত সংবাদপত্র শত সহস্র মুখে যে সব পলিটিক্যাল কাজের কথা কয়েছে তার মধ্যে আমার এ বে-পলিটিক্যাল বাজে কথা অবশ্য সমুদ্রে শিশির বিন্দুমাত্র। কিন্তু আমার ও বাজে কথার অন্তরে যদি কিছু সত্য ও তার দেহে যদি কিঞ্চিৎ রূপ থাকে তাহলে আমার এই কথাবিন্দু পূর্ব্বোক্ত শব্দার্ণবে মুক্তার মত ডুবে যেতে পারে কিন্তু তার তরল অঙ্গে মিলিয়ে যাবে না।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২২। বীরবল।

চিরন্তনী।

—:※:—

চোদ্দ বছর বয়েসের সময় হঠাৎ সে একদিন যেন কেমন হয়ে গেল—তার দেহের অস্থিরতা মনের চাঞ্চল্য সব যেন কোথায় লুকিয়ে গেল—তার খেলা ধুলোয় প্রবৃত্তি, গাল গল্পের সুখ, সমবয়স্ক সঙ্গীদের সঙ্গে মারামারি হুড়োহুড়ি কর্‌বার প্রলোভন সব যেন কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ছেলেরা ডাক দিয়ে যায় সে-ডাক তার কানেই পৌঁছে না। বন্ধুরা এসে খোসামোদ করে তাতে সে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। চারিদিকের কর্ম্ম ও খেলার চাঞ্চল্যের মাঝে সে নির্ব্বাক ও উদাসীন দেখে শুনে পাড়াপর্শিরা তার নাম রাখ্‌ল ক্ষ্যাপা।

ক্ষ্যাপা আপনার ছোট্ট ঘরটীর মধ্যে একা বসে' বসে' থাকে আর ভাবে কোথায় যেন একটা কি রহস্য আছে যেটা ভেদ কর্‌তে পার্‌লেই————— —

ভেদ কর্‌তে পার্‌লেই—কি হবে? তা শত চেষ্টাতেও ক্ষ্যাপার মনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না—কেবল রহস্যের নিবিড়তাই আরও নিবিড় হ'তে থাকে—তার উদাসী মন আরও উদাসী হ'য়ে যায়।

ক্ষ্যাপার অবসরেরও বিরাম হয় না, আকুলতারও শান্তি হয় না।

ফাগুন মাসে আমের গাছ সব মুকুলে মুকুলে ভরে যায়, তার মিষ্টি মৃদুগন্ধে আকাশ বাতাস মেতে ওঠে, মৌমাছিদের গুঞ্জন-প্রলাপে চারিদিকের নীরবতা অস্থির হ'য়ে ওঠে। ক্ষ্যাপা চোখের দৃষ্টি নিবিড় করে চেয়ে থাকে আর অস্পষ্ট হ'য়ে কেমন যেন তার মনে লাগে

রহস্যের বুঝি কিনারা হয় হয়—সহজ কথাটার সন্ধান বুঝি সে পায় পায়। তারপর ফাগুনের খেলা ভেঙে যায়—আমের মুকুল কুড়ি বেঁধে সবুজ হ'য়ে ওঠে, মৌমাছিরা আপনার বন-ভবনে ফিরে যায়—রহস্যের আর কিনারা হয় না—ক্ষ্যাপার কৌতুহলই কেবল বেড়ে ওঠে।

বৈশাখী সন্ধ্যায় কাল-বোশেখীর কাল মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়—সাদা বকের সার কাল মেঘের বুকদিয়ে উড়ে যায়—ঘূর্ণী বাতাস শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে উড়িয়ে আকাশে ওঠে—শন্ শন্ শব্দে বৃষ্টি নেমে আসে—কচুপাতার উপর দিয়ে স্ফটিকের মতো জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে—ক্ষ্যাপা এক মনে চেয়ে থাকে আর ভাবে ঐ বুঝি গোপন কথাটা স্পষ্ট হ'য়ে আসে আসে—কিন্তু মেঘ কেটে যায়, বৃষ্টি থেমে যায়, রাত্রি শেষে দিনের আলোয় চারিদিক স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে—রহস্যের আর কোন কিনারা হয় না—গোপন কথাটা গোপনই থেকে যায়।

এম্‌নি করে' বছরের পর বছর কাটে—রহস্যেরও আর কিনারা মেলে না—ক্ষ্যাপারও আর সোয়াস্তি হয় না। ক্ষ্যাপা ভাবে রহস্যের অনুসন্ধান বৃথা।

সেদিন সিউলি তলার সিউলি ফুলের রাশ ক্ষ্যাপার মনকে বিশেষ ক'রে উদাসী করে' দিল—রাজার বাগান থেকে বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসে—স্তব্ধ নিঝুম দুপুর বেলা রাখালের বাঁশীর সুর একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার ব্যথা নিয়ে নিয়ে ফেরে।

ক্ষ্যাপার সেদিন হঠাৎ চোখে পড়্‌ল এক বালিকা। তন্বী তার তনুলতা—কালো তার চোখ নিবিড়, তার কেশ—সারা দেহে তার থম্‌কে থাকা প্রাণের চাঞ্চল্য।

ক্ষ্যাপা চম্‌কে উঠ্‌ল—বালিকার চোখের দিকে তাকাতেই ক্ষ্যাপার হৃদয়টা স্ফাত সিন্ধুর মতো স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ল—ক্ষ্যাপা ভাব্‌লে—এইবার রহস্যের সন্ধান পেয়েছি।

কিন্তু রহস্যের কিনারা আর হয় না। বালিকা বকুলফুলের মালা গেঁথে গলায় পরে, কাঁচ্‌পোকার টিপ্‌ লাগায়, কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী দিয়ে কানের দুল তৈরী করে—তাতে রহস্য কেবলই নিবিড় থেকে নিবিড়তর হ'তে থাকে—বালিকা তার সারা দেহের বর্ণ রেখা ও সুর দিয়ে কি যেন একটা কথা বল্‌তে চায়—কি যেন একটা সন্ধান জানাতে চায়—সেটা আধ স্পষ্ট আধ অস্পষ্ট থেকে ক্ষ্যাপার অসোয়াস্তিই আরও বাড়িয়ে তোলে—রহস্যের আর কূল-কিনারা হয় না।

ক্ষ্যাপা ভাব্‌লে বালিকার সঙ্গে মিলন হ'লে রহস্যের কিনারা হবে।

ক্ষ্যাপার সঙ্গে বালিকার মিলন হল।

কিন্তু যে রহস্য ধরা-দেওয়া—দেওয়ার মতো হয়েছিল, তা কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। পুরুষের স্পর্শে বালিকা এক মুহূর্ত্তে নারী হ'য়ে জেগে উঠ্‌ল—পৃথিবীর বুক আঁক্‌ড়ে সেখানে ঘর বেঁধে বস্‌ল।

নারী একদিন ক্ষ্যাপাকে বল্‌লে—দেখ তুমি যে রহস্যের সন্ধানে ফিরছ সে রহস্যের আবির্ভাব হবার সময় এসেছে—আমি তার ব্যথা ও আনন্দ অনুভব করছি।

ক্ষ্যাপা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস কর্‌ল—কোথা থেকে তার আবির্ভাব হবে?

নারী বল্‌লে—আমার কামনা থেকে—আমার মৃত্যু থেকে।

নারীর পাশে এসে উদয় হল এক ক্ষুদ্র শিশু।

শিশুর কৌতূহল-বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে ক্ষ্যাপা ভাব্‌লে—হাঁ এইবার পেয়েছি, এইবার বুঝেছি।

কিন্তু ক্ষ্যাপা কিছুই পায় নি, কিছুই বোঝে নি—যেমনকার রহস্য তেমনি রয়ে গেছে। ধীরে ধীরে শিশু বালক হল, কিশোর হল, যুবক হল, যৌবন কাটিয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পড়্‌ল। ক্ষ্যাপা দেখ্‌লে রহস্য কিছুমাত্র স্পষ্ট হয় নি।

ক্ষ্যাপা মৃত্যু-শয্যায়। বিধাতা পুরুষ এসে বল্‌লেন—অনুসন্ধানী রহস্যের কিনারা পেলে?

ক্ষ্যাপা কষ্টে শেষ নিশ্বাস টেনে বল্‌লে—রহস্যের কিনারা কে চায়? আমি আজ মর্‌ছি কারণ রহস্যের নেশা আমার চোখ থেকে কে অপসারিত করে নিয়েছে। আর আমার চল্‌বার পথ নেই, চল্‌বার প্রয়োজন নেই।

২২শে মার্চ্চ ১৯২২। } শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

"গীতাঞ্জলি ও সত্য-কবিতা"

(আলোচনা)

—:০:—

উপরোক্ত প্রবন্ধ লেখকের সঙ্গে আমার যে অমিল সেটা কেবল মতামতের পার্থক্যে নয়, সাহিত্য জিনিষটাকে উনি যে ভাবে দেখেন আমি মোটেই সে ভাবে দেখি না,—এ বিষয়ে প্রকৃতিগত রুচিভেদ রয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তর্কবিতর্কে কোনো বিশেষ ফল হবে বলে আশা করি না। আমি সাহিত্যকে নিজের অনুভূতি, নিজের আনন্দের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করে থাকি। এই অনুভূতি এই আনন্দই আমার কাছে সত্য, পাশ্চাত্য দেশের সমালোচকদের মতামত, তাদের রুচিবিচারের নিয়মাবলী, কাব্যকে রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে বিশ্লেষণ করা সম্বন্ধে তাদের বিচিত্র বিধিবিধান..... এ সমস্তই আমার কাছে পরের কথা, এবং অনেকটা কম মূল্যবান। মুখে যা-ই বলুন না কেন, আমার বিশ্বাস আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞ বিচক্ষণ সমালোচক সম্প্রদায়ের মত এই প্রবন্ধ রচয়িতার মনও পুঁথিগত বিদ্যার সারে ও ভারে ভরাট হয়ে উঠেছে, নিজের স্বতন্ত্র ভাল লাগার বা মন্দ লাগার হাওয়া যে সহজে বয়ে যাবে সে পথ উনি খোলা রাখতে সাহস পান নি—দরকারও বোধ করেন নি। পশ্চিম দেশের লোকের বিচার শক্তির উপর এঁদের এতটা অন্ধ বিশ্বাস যে অজ্ঞাতকুলশীল যে কোনো বিদেশীয় লেখকের রচনা থেকে

খানিকটা উদ্ধৃত করে দিতে পারলেই এঁদের মন কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করে; প্রবন্ধের গোড়াতেই লেখক আড়ম্বর সহকারে এবং নিতান্ত নিশ্চিন্ত মনে Miss Sturgeon নামে কোনো এক ইংরেজ লেখিকার যে কয়েকটি অতিগম্ভীর পাণ্ডিত্য পূর্ণ মন্তব্য তুলে দিয়েছেন তাতেই এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে; তা ছাড়া, প্রবন্ধটা আগাগোড়াই নানা পাশ্চাত্যদেশীয় সমালোচকের, অতি পুরাতন যুক্তিতর্কের ছায়াচিত্রে এবং নিঃশব্দ পদ সঞ্চারণে পরিপূর্ণ। "New Wags in Literature" বইটা আমি পড়ি নি, কিন্তু উদ্ধৃত বাক্যগুলি পড়ে যে সেটা পড়বার জন্যে অধীর হয়ে একেবারে প্রাণপাত করতে প্রস্তুত হয়ে উঠেছি তাও নয়, কারণ অপাঠ্য ভাষায় সাহিত্যের অতি প্রচলিত কয়েকটা সাধারণ বাঁধি-গৎ পুনর্ব্বার আওড়াতে হলে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে যে অচেতন মনোভাব এবং আত্মবিস্মৃত ঔদাসীন্য প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন হয় তা দুর্লভ হলেও আধুনিক মাসিকপত্রের প্রসাদে সে-বিষয়ে আমাদের আর আক্ষেপ করার কোনো কারণ নেই, তা ছাড়া, বিলিতী বইয়ের নাম যতই হোক তার দামও যে অনেক বেশী! আসল কথা, যতদিন না আমরা বিদেশী সমালোচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারব, ওদের দেশের সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের অনুকরণে কাব্যকে অংশ প্রত্যংশে বিচ্ছিন্ন করে চুল-চেরা সমালোচনার দাঁড়ি-পাল্লায় চাপিয়ে তার রস ও বস্তুর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবার লোভ না কাটিয়ে উঠতে পারব, নিজের স্বতন্ত্র রুচির উপর ভরসা করে নির্ভয়ে দাঁড়াতে না শিখব, ততদিন আমাদের দেশের সমালোচনা কেবল আবর্জ্জনাই সৃষ্টি করবে, প্রাণ-সামগ্রী নয়।

কিন্তু এ গেল বাহিরের কথা। প্রবন্ধ-লেখকের দুএকটি মন্তব্য নিয়েও অল্প কিছু বল্‌বার ইচ্ছে আছে। যদি গোলাপ ফুল দেখে কেউ বলে আমার এ ভাল লাগেনা, খানিকটা রং আর গন্ধের অর্থহীন সংমিশ্রন দেখে খুসি হয়ে ওঠা আমার কাছে নিতান্ত মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় বলেই মনে হয়——তাহলে অবশ্য তার উপর আর কথা বলতে যাওয়া নিষ্ফল, কারণ যেখানে প্রভেদের হেতু এত গভীর-প্রতিষ্ঠিত সেখানে তর্কবিতর্ক করা কেবল শক্তির অপব্যয় মাত্র, এবং তা ছাড়া ভাল লাগা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করবার অধিকার সকলেরই আছে। পৃথিবীতে ত কত রকম লোকই জন্মগ্রহণ করে, কেউ রং-কানা, কেউ সঙ্গীত সম্বন্ধে উদাসীন, কারুর বা বই পড়বার চেয়ে ঘোড়ায় চড়বার সখ বেশী·····তা নিয়ে অনর্থক বিব্রত হয়ে লাভ কি? কথা কয়ে কি তাদের বদলানো যায়? বেশী বাড়াবাড়ি করলে মনে মনে হাসা চলে এই পর্য্যন্ত! কিন্তু ছাপার অক্ষরে দশ জনের সমুখে যদি কেবলি বলা যায় যে ঐ ফুলটা আমার ভাল লাগে না, এবং কেন লাগেনা তাও বুঝিয়ে বলছি, তা হলে অন্য কথা হল, কারণ এ জায়গায় "আমার ভাল লাগে না" বলার মধ্যে এই কথা বলার চেষ্টা রয়েছে, ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যে শুধু যে আমার লাগছে না তা নয়, আর কারুরত্ত ভাল লাগা উচিত নয়। এখানে অন্যের মতামতের বিরুদ্ধে একটা স্পর্দ্ধাপূর্ণ আহ্বান করা হচ্ছে, এবং সেই জন্যে অন্যের পক্ষেও উত্তর দেওয়া সম্ভব। গত সংখ্যার "অলকায়" যে প্রবন্ধটি বেরিয়েছে তারও ভাব এই, লেখক যে শুধু "গীতাঞ্জলি" পড়তে ভালবাসেন নি তা নয়, অন্যে পড়ে যে আনন্দ পাচ্ছে এ দেখেও তাঁর মনে বিরুদ্ধ-

ভাব জেগে উঠেছে। নইলে ঐ প্রবন্ধটা লেখার কোনো মানে থাকৃত না। উক্ত রচনার বিস্তৃত সমালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যে দুটি একটি কথা আমার মনে রয়ে গেছে তার উত্তরে কিছু বলেই এই প্রবন্ধ শেষ করব।

১। আমার প্রথম এবং প্রধান কথা এই যে, প্রবন্ধের নামকরণের মধ্যেই "গীতাঞ্জলি" সম্বন্ধে লেখকের একটা প্রকাণ্ড অবিচার ব্যক্ত হয়েছে। এ কথা সকলেই জানেন যে "গীতাঞ্জলি" তে যা আছে তার প্রত্যেকটিই হচ্ছে গান। গান মাত্রেই সুরের অপেক্ষা রাখে, তা না হলে তার অন্তরতম ভাবরূপের পূর্ণ বিকাশ হতে পায় না। গানের কথার মধ্যে কবি ইচ্ছে করেই সুরের জন্যে খানিকটা করে ফাঁক রেখে যান, সঙ্গীতে সেই ফাঁকগুলি ভরে দেয়। সুতরাং গানকে "সত্য-কবিতার" মাপকাঠিতে পরীক্ষা করতে যাওয়া বিশেষ রসজ্ঞতার পরিচায়ক বলে মনে হয় না। "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" এই গানটির উপরই দেখছি প্রবন্ধ লেখকের রাগ সব চেয়ে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে, তিনি বলেছেন এই গানের মধ্যে কোনো কবিত্ব প্রকাশ, মাধুর্য্য, কোনো সৌন্দর্য্যই নেই, এটা কেবল একটা ছন্দোবদ্ধ নীতি-উপদেশ মাত্র। কথাটা যে কতদূর হাস্যকর তা সরল সহজ মনে যিনি ঐ গানটা পড়েছেন, বা যাঁর ঐ গানটা সুর-সংযোগে শোনবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য ঘটেছে তিনিই বুঝবেন। এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলবার আছে বলে মনে করি না।

২। গীতাঞ্জলির গানগুলিকে খামকা তিন চার ভাগে বিভক্ত করার কোনো তাৎপর্য্য আমি বুঝতে পারিনি, এবং কোন্ আদর্শের দিক

থেকে, কোন principle হিসাবে যে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাগ করা হয়েছে তা আমার কাছে এবং খুবই সম্ভব অন্য পাঠকের কাছেও স্পষ্ট হয় নি। প্রত্যেক কবিতা পুস্তকেই নানাজাতীয় লেখা থাকে, কোনটা হয়ত আমাদের মন অনির্দ্দিষ্ট ব্যাকুলতায় চঞ্চল করে তোলে, কোনোটা হৃদয়ে গভীর পুলকের সঞ্চার করে, কোনোটা বা নিবিড় বেদনায় মীড় টেনে টেনে চলে; কিন্তু এর মধ্যে কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীর রচনা হঠাৎ ভাল লেগে গিয়েছে বলে শুধু তারই খানিকটা প্রশংসা করে অন্যান্য লেখার মধ্যে যে কবির কবিত্বশক্তির অবনতির পরিচয় দেখাবার চেষ্টা করতে হবে এমন অদ্ভুত কথা ত কখন শুনিনি! যদি কেউ বলেন সেই ধরণের লেখাই আমার ভাল লাগে যা তেমন গভীর ভাব-সম্পদে পূর্ণ নয় অথচ মনকে বেশ একটু দোলা দিয়ে যায়, চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে তোলা যার উদ্দেশ্য নয়, মনকে হিল্লোলিত করে তোলাতেই যার সার্থকতা,—তাহলে কিছু বলবার থাকে না; কিন্তু এইখানেই বিরত না হয়ে যদি তিনি আরো বলে বসেন যে ভাব-মূলক কবিতা মাত্রেই কবিতা হিসাবে অচল, এবং সেই সব রচনার মধ্যে যদি কবির প্রতিভার অবসান এবং অস্তগমনের চিহ্ন দেখাবার অক্লান্ত চেষ্টা চলতে থাকে তাহলে আর চুপ করে বসে থাকা উচিত বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের যে-গানগুলি লেখক মহাশয়ের অত ক্রোধের কারণ হয়েছে সেগুলি দেখছি সবই ভাবের গভীরতায়-পূর্ণ রচনা; কিন্তু এ ধরণের লেখা ত কবির শৈশব-সঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক কবিতা পুস্তকেই কিছু না কিছু আছে, এ পাপ ত উনি নতুন করে করছেন না? ঐ যুক্তি অবলম্বন করে কবির আধুনিক রচনার উপর অতটা বিরুদ্ধ-

ভাবাপন্ন হয়ে ওঠবার কি কোনো প্রকৃত হেতু আছে? আসল কথা, নতুন কোনো জিনিষকে উদার মনে আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করে মেওয়ার শক্তি খুব কম লোকেরই থাকে, বরাবরই সাহিত্যে সমাজে ও লোকালয়ে এই ধরণের লোকই বেশী দেখা যায় যারা নূতনত্বের নাম শুনলেই মার-মূর্ত্তি হয়ে ওঠে এবং প্রাণপণে তাকে অপমান করবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। এই অকারণ বিরোধই কিন্তু সেই নব-আগন্তুকের প্রকৃত প্রয়োজনের একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ, বোঝা যায় ওষুধের ফল এরই মধ্যে ফলতে সুরু করেছে। রবীন্দ্র-নাথ চিরজীবন সাহিত্য জগতে নব নব পন্থা উদঘাটন করতে করতে চলে এসেছেন, এবং যখনই তিনি কোনো পুরাতনের জীর্ণ সংস্কারকে আঘাত করে নূতন-আলোর বাণী প্রচার করেছেন তখনই একদল পুরাতনের অন্ধ-উপাসক সমস্বরে আর্ত্তনাদ করে উঠেছে, এবং সাধ্য-মত তাঁর কাজে বাধা দিতে ত্রুটি করে নি। কোনো প্রকার স্বাধী-নতা, ঔদার্য্য, বা নূতনত্বের বিরুদ্ধে এদের যে আন্তরিক বিতৃষ্ণা তা কিছুতেই দূর হয় না, কারণ লক্ষ্য করে দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয় যে যে-সকল লোক রবীন্দ্রনাথের কোনো নূতন রচনা পড়ে এককালে বিষম ক্ষিপ্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, সেই লেখাটা যখন কতক সয়ে গেল এবং তার বাণী যখন মনে কিছু কিছু সঞ্চারিত হল তখন সেই সব লোকই ফের তাঁর সেই লেখারই দোহাই দিয়ে কবির অন্য রচনার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হল। "কড়ি ও কোমল" "সোনার তরী" প্রভৃতি কবির প্রায় কবিতা পুস্তককেই এই নিন্দা, অপমান, ও ঈর্ষার ঝড় কাটিয়ে আসতে হয়েছে, এখন দেখছি "গীতাঞ্জলি" বা অন্যান্য আরো শেষের দিকের লেখার

বিরুদ্ধে লোকের নিদারুণ মনঃক্ষোভ ঘূর্ণিবায়ুর মত আবর্ত্তিত হয়ে উঠেছে। যাঁরা এক সময় কবির আগেকার কবিতার প্রতি যথাশক্তি কটুবচন প্রয়োগ করতে ছাড়েন নি এখন দেখছি তাঁরাই সেই সব পুরাতন লেখার দিকে তাকিয়ে ভাবে বিভোর হয়ে উঠেছেন এবং অশ্রুবাষ্পাকুল কণ্ঠে বলে বেড়াচ্ছেন—"হায়, আমাদের সেই রবীন্দ্রনাথ যাঁর প্রাণোন্মাদিনী বীণার ঝঙ্কারে বাঙালীর কোমল প্রাণে কত না মধুর ভাবের মদিরতা এনেছিল, কত না ব্যথা জেগে ছিল, তিনি কি না শেষে এই "গীতাঞ্জলির" মরুপথে একলা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বল ভাই এও কি সওয়া যায়, এও কি চোখে দেখে চুপ করে থাকা চলে, এও কি……ইত্যাদি ইত্যাদি"! এই সব অসংযত বিলাপবাক্য কৌতুক ও কৌতূহলের খাতিরে খানিকক্ষণ শোনা চলে, কিন্তু অতিমাত্রায় হলে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে, ঘুম পায়!

৩। লেখক বলেছেন রবীন্দ্রনাথের এখনকার লেখা আর "নূতনত্বে প্রাণ চমকিত করে না," "পুরাতন বন্ধুর মত আনন্দ দান করে।" নিন্দাচ্ছলেই অবশ্য কথাগুলো বলা হয়েছে, কিন্তু শুধু এইটুকু শুনলে বোঝা শক্ত কবির বিরুদ্ধে কিছু বলা হচ্ছে, না তাঁর প্রশংসা করা হচ্ছে! কেন তা বলছি।

"নূতনত্বে প্রাণ চমকিত" করার মানে কি? লেখক কি মনে করেন যে যাদুকর যেমন রুমালের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা মস্ত পাখী উড়িয়ে দিয়ে সকলকে চমকিত করে দেয়, সেই রকম ভাষা ও ছন্দের মধ্য থেকে অকস্মাৎ কোনো একটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাব প্রকাশ করে পাঠকের মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়াই কবিতার

চরম উদ্দেশ্য? দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত কিছু অন্য রকম। মোটের উপর ধরতে গেলে জন্ম, মৃত্যু, ভালবাসা এই রকম দুচারটে বড় বড় ব্যাপার অবলম্বন করেই আজ পর্য্যন্ত জগতের যা কিছু সব চেয়ে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিত হয়েছে; এবং প্রকৃত-পক্ষে, এই সকল চিরন্তন সত্যকে ক্ষণে ক্ষণে নূতন করে দেখার শক্তিতেই কবির সঙ্গে সাধারণ লোকের প্রভেদ। অভ্যাস এবং নিত্য পরিচয়ের মোহাবরণ কিছুতেই তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে না, তিনি সদ্যোজাত শিশুর মত বিশ্বকে বিস্মিত পুলকে তন্ময় হয়ে দেখতে থাকেন, আর তাঁর এই অপূর্ব্ব আনন্দ আমাদের প্রাণও উদ্দীপিত করে তোলে। লেখক নিজেই বলছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা পরিচিত ভাবের ভিতর দিয়ে মনকে আনন্দিত করছে। তা যদি হয় তাহলে ত কোনো কথাই নেই, এর চেয়ে বড় প্রশংসা কবির পক্ষে আর কি হতে পারে?

৪। সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে জন সাধারণের মনে কি বিচিত্র অদ্ভুৎ সব ধারণা থাকে! কবিতায় "বিশুদ্ধ অনুভূতি" বা "অনুভূতির স্মৃতি" কোন্‌টা থাকলে কবিতা সাহিত্য হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে এ নিয়ে লেখক-মহাশয় বহুক্ষণ ধরে বাক্যজাল বিস্তার করে নিজের শক্তির অপব্যয় করেছেন। তিনি বলতে চান কবিতায় "অনুভূতির স্মৃতি" থাকলে সে কবিতা হেয় হয়ে পড়ে, সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য চলে যায়। তিনি কবিতার মধ্যে সদ্য ভাবের তপ্ত কায়া, না তপ্ত ভাবের সদ্য ছায়া এমনি কি একটা কিছু অনুভব করতে চান, এবং যে কবিতা তাঁর মনের এই সুখসাধ পূর্ণ করতে পারে তাকেই তিনি বলেন "সত্য কবিতা" "বিশুদ্ধ অনুভূতির

কবিতা।" তাঁর বিশ্বাস মনে ভাব আসামাত্র তৎক্ষণাৎ একটা নোটবুক ও পেন্সিল নিয়ে বসে গেলে তবেই যথার্থ কবিতার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে তাজমহল দেখার অনেক পরে এলাহাবাদে এসে সে বিষয়ে কবিতা লেখেন, তাঁর মনের অনির্ব্বচনীয় ভাবরাশি যে বিশ্ব সাহিত্যের এই একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কবিতায় ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে এর জন্যে সমালোচক মহাশয়ের কাছে ঐ কবিতায় "বিশুদ্ধ অনুভূতির" নিদারুণ অভাব ঘটেছে। লেখক নিজে হলে বোধ করি তাজমহল দেখামাত্র সেই মুহূর্ত্তেই বিনাবাক্যব্যয়ে পাথরের উপর বসে পড়তেন এবং পকেট থেকে সযত্নরক্ষিত খাতাটি বার করে—

"ওরে তাজ
তোরে আজ
কী যে ভালবাসি।...ইত্যাদি বলে

মন ও পেন্সিলের একেবারে পঞ্চাব মেল ছুটিয়ে দিতেন! এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই এক সময়ে একেবারে শেষ কথাটি বলে দিয়েছেন, কথাগুলো এই—

"* * * কোন সদ্য আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে তখন যে, লেখা ভাল হইবে এমন কোনো কথা নাই। তখন গদগদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না, তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্য রচনার পক্ষে তা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিতার রং ফোটে ভাল। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে—কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায়

না। শুধু কবিত্বে নয়, সকল প্রকার চারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটা নির্লিপ্ততা থাকা চাই—মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্ত্তা আছে, কর্ত্তৃত্ব তাহারি হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে যায় তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয় প্রতিমূর্ত্তি হয় না।"

অনেকদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেছেন, সুতরাং "শেষ বয়সের বিকৃত বিচার" বলে উঠলে চল্‌বে না। লেখক-মহাশয় ত সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরেজ লেখকের নাম শুন্‌লেই আত্মহারা হয়ে ওঠেন, তিনি কবিতা সম্বন্ধে Wordsworth-এর সর্ব্ববাদীসম্মত সেই বাক্যগুলি কি ভুলে গিয়েছেন যে "Emotion remembered in tranquillity"-ই হচ্ছে কবিতার প্রকৃত উপাদান।

৫। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি ও সাধকের বিচ্ছেদ ঘটেছে এ কথা নূতন বটে! আমরা ত জানতাম কি দেশে কি বিদেশে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছে যে "সাধক ও কবির হরগৌরীর মিলনেই" তাঁর প্রতিভার প্রধান বিশেষত্ব। তিনি ভগবানকে পাওয়ার জন্যে সংসার ছেড়ে অদৃশ্য মরীচিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন নি, মানুষের প্রতিদিনকার জীবনের সুখে দুঃখে, তার বিচিত্র অনুভূতি অভিজ্ঞতার মধ্যেই তিনি সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয় পেয়েছেন, সংসারের মধ্যে থেকেই তিনি সংসারের উর্দ্ধে উঠ্‌তে পেরেছেন। নিরাসক্ত নির্ব্বিকার সাধক বলতে যা বোঝায় তা তিনি কোনদিনই হতে পারলেন না। "গীতাঞ্জলির" সময় থেকে যে রবীন্দ্রনাথ কেবল, "নিছক নীতিকথা এবং দার্শনিক তত্ত্ব" বিবৃত করে আসছেন, কবির "ফাল্গুনী" "গল্প সপ্তক," "পলাতকা" এক তাঁর এখনকার "কথিকা" ও "শিশু"

কবিতা পড়ে লেখকের কি শেষে এই কথাই মনে হল। তিনি বলছেন খেয়া, নৈবেদ্য, ও গীতাঞ্জলির "অন্বেষণ, আবেদন ও নিবেদনের সুরের" পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের "অন্তরের সাধক-আমিটি কবিকে পশ্চাতে ফেলিয়া বিশ্ব-বৈচিত্রের বাহিরে ছুটিল।" এর পর আর নিরুত্তর হওয়া ছাড়া কি উপায় হতে পারে?

৬। সমালোচকের শেষ মন্তব্য এই যে রবীন্দ্রনাথের যা বলার ছিল তা ফুরিয়ে গেছে তাঁর আধুনিক রচনা পড়ে ওঁর (সমালোচক মহাশয়ের) হৃদয় আর "অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠে না," অনুভূতির পশ্চাতেই অশ্রু প্রবল হয় না।" কথাটা যে দুঃখের সে বিষয়ে সন্দেহ কি।—কিন্তু আশা করি তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টি সাঙ্গ করবেন না, এবং কবির লেখা পড়ে যাঁরা যথার্থ আনন্দ পেয়ে থাকেন তাঁদেরও প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁরা যেন এই আকস্মিক শোকের আঘাতে আত্মহারা না হয়ে পড়েন। জগতে সর্ব্বদাই কত দুর্ঘটনা ঘটছে, কিন্তু সে যে অনিবার্য্য; সব কথা ভাবতে গেলেও কি আর চলে! কথায় কথায় চোখে "অশ্রু প্রবল" হয়ে উঠলে যে সকল কাজেই বাধা পড়বে, সংসারে বেঁচে থাকাই শক্ত হয়ে উঠবে! আর, সমালোচক-মহাশয়ের এই নিদারুণ মর্ম্ম-ব্যথার প্রতিবিধান করাও যে আমাদের সাধ্যাতীত, কারণ যার কোনো একটা জিনিষ কিছুতেই ভাল লাগছে না তাকে কি জোর করে সে-জিনিষ ভালবাসানো যায়? আমরা কেবল এইটুকু বল্‌তে পারি যে আমাদের কিন্তু খুব ভাল লাগছে! নিজের দিক থেকে আমি অকপট চিত্তে স্বীকার করছি যে রবীন্দ্রনাথের নূতন রচনা পাবার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে থাকি, যেদিনে ওঁর কোনো

নূতন লেখা বেরোয় সে-দিন আমার কাছে স্মরনীয়, এ বিষয়ে আমার আকাঙ্খা এবং আনন্দের অবধি নেই। কবির প্রথম দিকের লেখা কি শেষের দিকের লেখা দু-ই আমার কাছে সমান উপভোগ্য; "একরাত্রি" আমার যেমন ভাল লাগে "শেষের রাত্রি"ও তেমনি, "কথা ও কাহিনীর" গল্প আমাকে যেমন আনন্দ দেয় "পলাতকার" গল্প কবিতাও তার চেয়ে কিছু কম দেয় না, এখন তিনি যে "শিশু" কবিতা লিখছেন তা আমাকে ততটাই বিচলিত করে যেমন করেছিল তাঁর আগেকার "শিশু" পুস্তকের কবিতাগুলি। "কথিকা" যখন পড়ি তখন পাশ্চাত্য দেশের বহুবিখ্যাত prose poem জাতীয় যা কিছু সাহিত্য সামগ্রী আছে সমস্তই আমার কাছে মলিন হয়ে যায়; "পথ-মোচন" আমার মনের অনেক রুদ্ধ দ্বার নূতন আলোকের দিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

আর আমার কিছু বলবার নেই। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একবার বলেছিলেন যে "মানুষের বোঝবার শক্তির সীমা আছে কিন্তু তার না বোঝবার শক্তি অসীম।" এই সারগর্ভ সত্যটি স্মরণ করে এই প্রবন্ধ শেষ করি। ইতি—

চৈত্র ১৩২৮। শ্রীঅমিয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বক্‌শীস্‌*

—:*:—

বংশীবাবু শিকদারপুরের জমিদার। চাইর পরগণায় তিনির এলাকা। তার মধ্যে মস্ত একটা জমিদারী পদ্মার পারে। আর সব পরগণা থিকা এই পদ্মাপার্যা জমিদারীতেই তিনির আমলা ফয়লা পাইক বরকন্দাজ খাটে বেশী। পদ্মার ভাঙুনিতে জমিদারীর খেত্তিও যেমুন আবার জমিদার যদি চোটালু হন তায়লে লাভের মাত্রাও তেমনি জ্যায়দা। সে লাভ পদ্মার চর দখল নিয়া।

বর্ষার আসন আসন কালে গাছ গাছালির আবডালে দালান কুঠার রমরমা যে গাওখান দেখ্যা চোখ ফিরাণ যায় না, শাওন মাস যাত্যে না যাত্যেই দেখা যায় সেখান দিয়া ঘুন্নাপাক আর জলকায় ভরা গহিণ গাঙ্‌। তা দেখ্যা কোন কালে সেখানে একখান ডেরা কুড়া কি একটা কলাগাছও যে আচিলো তা ঠাওর করে কার সাধ্যি! ইসন পোষ মাঘের শুক্‌না গাঙেও যেখান দিয়া জাহাজ চলে ফিরা, কার্ত্তিকে দেখা যায় সেখানে মুলুকজোরা বালুচর রৈদের জিলে ঝিক্‌মিক্‌ করত্যাচে। পদ্মানদীর কাম ক্যাবল এই ভাঙণ, আর গরণ; তার ফলে জমিদারের এলাকা আর রায়তের জোৎ কিছুরই ঠিকানা থাকে না। তাই চর মুলুকে যার লাঠি তারি মাটি।

পদ্মাপারে যে সব রায়ৎ বসৎ করে তাগোরে কাম খালি মনিবের হৈয়া চর দখল করণ। হাল বাওনের বেলায় নাঙল্‌ পাইল

*মাণিকগঞ্জের মৌখিক ভাষায় লিখিত।

মতন চালাব্যার পারুক আর না পারুক, চর নিয়া কাইজা করণের সোমে লাঠী তাগোরে পরায় মানষের হাতেই চরক গাছের মতন ঘুরে। হাল গরু বেবাকের নাই, পাকা বাশের টুক্‌টুকা একখান কর্যা লাঠি ক'ল বেবাকেরি আছে। টান দেশী গিরস্তেরা পদ্মা পার্যা গোরে ঠাট্টা কর্যা কয়:—

পদ্মাপার্যা রায়ৎ গোর লাঠী হাতে হাতে
গাঙের দিকে মুখ ফিরায়্যা ভাত মাখেন পাতে,
মাখা ভাতটী নাই ফুরাত্যে ভাইঙা পরে ঘর,
সান্‌কির ভাত কোছে ভর্যা খুজেন আরেক চর।

আবার পদ্মাপার্যাও টান মুলুকের মানষের নামে—

টান দেশী গিরস্তগোর বাপকালান্যা ঘাটি,
আঠু জলে ডুব দেন আর বুকে ঠেকে মাটি
আপনেরা পাও মেইলা বস্যা হুকায় মারেন টান,
এক পহরের পথ ভাঙ্যা বউ, জল আন্‌ব্যার যান।

এই ছরা আওড়ায়্যা তাগোরে খ্যাপাতে রেয়াৎ করে না।

পদ্মাপারে বংশীবাবুর অনেক লাঠ্যাল রায়ৎ। আর তাগোরে সর্দ্দার গফুর খার দাপটে চর মুলুকে তিনির নামে বেবাকেই থরি হরি কম্প। মাথার বাবরীটা এলায়্যা মাল্‌কোচা মারা গফুর খা লাঠী হাতে যখন দলের আগে ডাক ছার্যা খারায়, তখন তার একলার মোরা নেওন শতেক লাঠ্যালের সাহসেও কুলায় না। বংশীবাবুর লাঠ্যালের চোটে তিনির লগে কাইজায় না পার্যা, এক হাতিবান্ধার ভৈরব বাবু ছাড়া আর সকল জমিদারই হাইর মান্‌চেন। ভৈরব বাবুর জমিদারীর আয় বংশীবাবু থিকা কিছু বেশী, লাঠ্যাল সর্দ্দারও

তিনির কম নাই, তবু যে তিনি পার্‌য়া উঠেন না তার একমাত্র কারণ গফুর খার মোরা নেওনের মতন লাঠ্যাল তিনির এলাকায় নাই। বংশীর বাবুর লগে কাইজায় যতই হারেন জিদ্ তিনির ততই চর্‌য়া যায়। পর্‌তি বারেই তিনির লাঠ্যালের দল চরে থিকা বেদখল হয়্যা ফিরা আসে আর কয়—মনিষ্যের কাছে কি আমরা হটি, গফুর সর্দ্দারের জিন পরির আশ্রয় আছে তারে হটানের সাধ্যি মনিষ্যের নাই।" একজায় গফুর খার নাম শুন্যা ভৈরব বাবুর রুখ চাপল্যো যত্‌কে যতই হোক এই লোকটারে হাত করনই চাই। রুখ চাপল্যে কি হৈবো? টাকা পয়সা জমি জিরাৎ কিছুর লোভেই গফুর সর্দ্দারের মন টৈল্‌লো না। ভৈরব বাবুর চর যতবার যায় "মনিবের ভিটা সয়তানে ছারে" তার মুখে এই একই জোয়াব শুন্যা শুন্যা ফির্‌য়া আসে। শেষে একবার সে তিনির চরের এমুন অপমান কর্‌য়া দিলো যে না পার্‌য়া তিনি চর পাঠান রহিৎ কৈর্‌লেন।

গফুর খার গিরস্তালির মধ্যে মানুষ মাত্র তিন জন। সে নিজে তার বিবি আর ছাওয়াল রমজান। আশ পাশের লোকের কাছে সর্দ্দার মানুষের খাতির মুরাদ যতই হোক তাগোরে বিবি হওন যে কি—তা রমজানের মার মতন কেউই জানে না। টান দেশী গিরস্তের বেটী সে—বাপ ভাইয়েরে দেখচে দিনমান খ্যাতে কাম করে সাঁঝ সকালে ঘরে আস্যা, ছাওয়াল পাওয়াল নিয়া আমোদ আহ্লাদে খায় দায়, জোচনা রাইত হৈলে পারা পোশি জন কয়েকে মিলা গল্প সল্প বা বয়াৎ গান করে, আর তামান রাইত মনের সুখে নিদ্রা যায়। সর্দ্দারের বিবি হওন যার কপালের লেখা তারই সকল সুখের কথা মনে আনন, চক্ষু মেল্যা স্বপন দেখনের সমান।

লাঠ্যাল সর্দ্দারের ঘর গিরস্তালি তে বেবাক কামই আল্যা মাল্যা। রান্ধন বারণ সারা হৈচে, সাঙ্গে বারাভাত, এমুন সোমে ডাক আইলো আর কার ভাত কে খায়, সর্দ্দার লাঠী হাতে বার্‌য়্যা পৈলো। তার পরে এক লাগারে কয়দিন তলাক সে আছে কি নাই তাও টের পাওনের জো থাকে না। ইরকম মান্‌ষের জানের উপর ভরসা রাখন আর ভরা গাঙের ভাঙুনী পারে ঘর বান্ধ্যা থাকন একই কথা।

আধেক বয়েস একা একলা চিন্তায় ভাবনায় ভাজা ভাজা হয়্যা কাটানের, পর ভাটি বয়েসে যখন বিধাতা দয়া কর্‌য়া রমজানেরে সর্দ্দারের বিবির কোলে দিলেন তখন সে মনে মনে ঠিক কৈর্‌লো যদি বাচায়্যা তুল্‌বার পারে, তয় ছাওয়ালেরে আর লাঠ্যাল সর্দ্দারের কাম কর্‌ব্যার দিবোনা। তার বাপ ভাইগোরে মতন নিজের ছাওয়ালটীও লক্ষীর পুৎ গিরস্ত হৈয়া সুখে সচ্ছন্দে বাস বাস্তব্য কৈর্‌বো এইটা আছিলো তার মার মনের একমাত্র সাধ। আর সেই আশা ফলায়্যা তুলনের লাইগা যতকষ্টই তার নিজের হোক্ না তা বরদাস্ত করনে সে একপায় খারা আছিলো।

ছাওয়াল পাওয়াল কঞ্চি বাঁশ, যে পাইলে নোয়াও সেই পাইলেই নোয়ায় যা শিখান যায় তাই শিখে, বাপের দেখাদেখি পাছে লাঠ্যালিরদিগেই রমজানের মন যায় তার মার মনে মনে এইটা আছিল এক আশঙ্কা। তাই ছয় বছুর্‌য়া ছাওয়াল রমজানের নিয়া সে বাপের বাড়ী যায়্যা দেখ্‌লো দিনকয়েকের মধ্যেই ছাওয়াল তার দাদু আর দাদির বাধুক হৈচে, আর বাড়ীর চেংরার দলে খেল্যা বেড়াত্যাচে তখন সে রমজানেরে তাগোরে কাছেই রাখ্যা

আসন ঠিক কৈর্‌লো। সোয়ামির ঘরে একলা ফিরণ কালে মনটা ধূক্ ধূক্ কর‍্যা উঠ্‌লেও সে একলাই ফির‍্যা আইলো। একমাত্র ছাওয়াল কাছ ছাড়া হওনে, থাক্যা থাক্যা তার বুকের মধ্যে ফাপর কর‍্যা উঠ্‌লেও পার্য্যমাণে সে তারে আন্‌ব্যার চাত্যোনা। গফুর খাঁ নিজে যায়্যা পাইল পরবের উষ্টুম্বে যখন নিয়া আস্‌ত্যো তখনো মাসেক যাত্যে না যাত্যেই নানান্ ছুত্যা নাতা কর‍্যা সে আবার রমজানেরে তার মামাগোরে বাড়ীতেই পাঠায়্যা দিতো।

গফুর সর্দ্দারের দুনিয়ায় মান্যা চলনের মানুষ, আচিলো মাত্র দুইজন। এক মনিব আর বিবি। মনিবের হুকুমে সে জান দেওনেও কবুল, খালি লাঠি ধরণ আর মনিবের হুকুম মানন এই দুই কাম বাদে বাকী সব্‌তাতেই সে আচিলো বিবির বশ। তাই সোমথ বাপের একমাত্র বেটার মামাবাড়ীতে মানুষ হওন সর্দ্দারের কাছে নেহাৎ না-পছন্দের কাম হৈলেও তা নিয়া মধ্যে মধ্যে খালি এক আধটু খিচ্ মিচ্ করণ ছারা ছাওয়ালের আপন বাড়ীতেই রাখনের লাগ্যা সে বিবির উপ্‌রে কোন রকম জোর খাটাব্যার পারে নাই। রমজান মামাবাড়ীতেই মানুষ হব্যার লাগ্‌লো।

রমজানের দাদু বুড়া মিঞার গিরস্তালির মতন সাইরের গিরস্তালি সে গেরদায় বড় আচিলো না। ছাওয়াল আর বৌরা, ঘর গিরস্তালির তামান কাম নেওনে বুড়া বুড়ী, সংসারে থিকা একরকম আল্‌গোচ্। পাচউক্ত ঠিক মতন নমাজ পরণ আর বাকী সময় নাতি নাস্কোর নিয়া আমদ আল্লাদ করণই এখন বুড়া মিঞার কাম। এত বড় সুখের সংসারে আস্যা খালি খেলানে বেড়ানেই রমজানের দিন কাটব্যার লাগলে।

আট ছারায়্যা নয়ে পর‍্যা
নয়া নাঙল আনে গর‍্যা
নও ছারায়্যা দেশে পাও
গিরস্তের পো চকে যাও

গিরস্তের ছাওয়াল দশ এগার বছর বয়েস হৈলেই বাপ ভাইয়েরে লগে হাল গরু নিয়া যায়, নিজে খেত-খোলার কাম শিখে আর তাগোরেও আগরের কামে অল্প বিস্তর সাহায্যও করে। বুড়া বুড়ির সোয়াগ্যা নাতি বল্যা এগার বছর পার হয়্যা গেলেও বাড়ীর কেউই রম্‌জানেরে উঠ্যা বস্‌ব্যারও কৈতো না। তার উপ্‌রে এক, মামারো মামীবাদে বাড়ীর আর বেবাকের কাছেই তার আখইট্ আব্দারও বেশ খাট্‌তো। গায় জোর থাকনের ফলে আসনের দিনে থিকাই বাড়ীর চেংরার দল কেউ ডরে কেউ বা ভালবাস্যা তার এক্‌বারি বশ হয়্যা পৈলো। এই রকমে সকল দিগ্ থিকাই লাই পায়্যা দিনের দিন তার স্বভাবটা হয়্যা উঠ্‌লো খুব একরোখা। এম্নে বচ্ছর কয় কাটনের পরে তার দলে তোক্কা আস্যা জুট্‌লো। তোক্কা রমজানের মামাগোরে পাড়ারই আর একজন গিরস্ত আকবর সেকের ম্যায়ার ঘরের নাতিন। তোক্কা আর সকলের মতন না বোধ করি, এই জন্যেই তার উপর রমজানের খুব টান পর‍্যা গেলো। রমজান যখন ১৮ বচ্ছর‍্যা যুয়ান বয়েস বারনের লগে, তার ছোট্ট-কাল্যা চলন চরিত্রি তোক্কার উপর তার পরাণের টান একটুও কমে নাই।

রমজানের দাদু বুড়ামিঞা যেমন মারা-যায় সে ফিরাকার শাওন মাসে পদ্মার চোরা ভাঙুনির চোট সে মুলুকের চেংরা বুড়া কেউই কোনকালে ভুলব্যার পার্‌বো না। পাতলা পাতলা দেওয়ায় ভার

চাইর দিগ নিভাজ থমথরা,—ঝর বিষ্টি তুফান তাফানের নাম গন্ধও নাই, তবু জলের সেকি কলকলানি ডাক! আর গাঙের খারা ভাঙুনির মুখে চাপের উপুর চাপ পরণ। গিরস্তেরা ঘরের জিনিষ বাইর করব্যার যায় তো গোরু সাম্‌ল্যাব্যার পারে না, নাওখান পারে ভিরায় তো মানুষ তুলব্যার পারে না। চাইর দিগে খালি হৈ চৈ। কে কারে দেখে! যার যার তা নিয়া সকলেই ব্যস্ত। এই দারুণ ভাঙুনির চোটে পুর্‌য়া দুইটা দিনও লাগলো না—গফুর সর্দ্দার গোরে গাওখান নিচিন্ন হয়্যা পদ্মার জলে মুছ্যা গেল। যা গোরে ইষ্টি কুটুম বাড়ী ধারে কাছে আচিলো, তারা গরু বাছুরের রাখণের আর নিজেগোরেও মাথা গুজনের ঠাই কর্‌য়া জিনিষ পত্রও কিছু কিছু বা সারাব্যার পাইর্‌লো, আর যা গোরে তা নাই তাগোরে দুঃখের আর সীমা রইলো না। গফুর সর্দ্দার একা মানুষ। সাহায্যের অভাবে জিনিষ পত্র বেশী কিছুই বাইর করব্যার পারে নাই, বিবিরে নায় উঠ্যায়া সারাসারি কর্‌য়া একলার দুইখান হাতে যা কিছু তুলব্যার পারছিলো তা বেবাক সমেৎ বিবিরে তার ইচ্ছামত বাপের বাড়ী পাঠায়্যা দিয়া নিজে পারা পোর্শিগোরে এই দারুণ মুস্কিলের দিনে তহিৎ তাদরক কর্‌য়া ফির্‌ব্যার লাগলো।

একেই তো নদীর চরে চরে উরাট্যা গিরস্তালি সর্দ্দারের বিবি ইস্তককালে পছন্দ করে নাই, তার উপর-ই ফিরাকার সর্ব্বনাশ্যা গাঙ ভাঙুনিতে ঘর গিরস্তালির তামান জিনিষ খোয়া যাওনে চর্‌য়া বসতির উপর সে হারে হারে চট্যা গেচে। তাই বাড়ী ভাঙনের পর বাপের বাড়ী যায়্যা টানদেশী গোরে সিঙ্গিলের গিরস্তালি তার চোখে আর আর ফিরা থিকা দুগুন ভাল ঠেকব্যার লাগলো। সে

মনে মনে ঠিক কর্‌য়া ফেলাল্যো সর্দ্দারেরে বুঝায়্যা পরায়্যা টান মুলুকেই নতুন গিরস্তালি সুরু করন চাই। ইসব তা লিয়া তার মনের মধ্যে অষ্টক্ষন বুঝাপড়া চল্‌ত্যাচে—ইয়ারি মধ্যে আচাম্বিতে একদিন আকবরের নাতিন তোক্কারে দেখ্যা তার মনে আর একটা নতুন সাধের উদয় হৈলো। আর, তার পরদিনই আকবর সেকের পুবদুয়ার্‌য়া ঘরের দাওয়ায় বস্যা রমজানের মার লগে তোক্কার মার যে কথা হৈলো—তাতে দিন কয়েকের মধ্যেই গায়ের পরায় মানুষেই শুনলো যে রমজানের লগে তোক্কার বিয়া এক রকম ঠিক ঠাক।

রমজানের কানে যখন এই খবরটা গেল সুখের তুফানে তার বুকের মধ্যে তোলপার। যে দিগে তাকায় সেই দিগই তার চোখে ভরা ভরা ঠেকে। সাথী সাঙাত যত জনের লগে দেখা হয় বেবাকেরি উপর তার মনের টান রোজকার থিকা বেশী ঠেকব্যার লাগলো। তার তেলে-টুকটুক্যা বাশের নস্কিদার বাশীটার উপর ইলিমের অনেক দিন থিকা নজর। কতবার চায়্যা ও সেটা যে পায় নাই, সেদিন না চাত্যেই আগেথিকা রমজান তারে সেটা একবারে দিয়া ফেলাল্যো দেখ্যা তার তো তাক লাগ্যা গেচে। খালি বাশীটাই না,—পালা-শালিকের ছাওটা, পাহার্‌য়া ব্যাতের লাঠীখান, আরো তার নানান রকমের হাউসের অনেক জিনিষ সে আইনা তার সাথী গোরে ডাক্যা আন্যা বিলায়্যা দিলো। সেদিন খালি তার মনে হত্যায় লাগলো আগেরি মতন মাঠে মাঠে লবনদার্‌য়া আর বিলের অঠাই জলে চোরা ডুবি খেলানের বয়েস আর তার নাই। খেলার সাথীগোরে পাছে ফেলায়্যা এই একদিনেই সে য্যান বুঝমন্ত যুয়ান মানুষটা হয়্যা উঠচে।

বাড়ী ভাঙনের পরে থিকা গফুর সর্দ্দারের আর ফুরসুৎ নাই। নতুন গেরামের পত্তনের কি করণ না করণ সে সবতার বৈঠক তার গরজ ছারা হয় না, জমিদারের দরবারে হাটাহাটির বেলাই ও সেই। সে যা করে বা কয় আর সকল মাতব্বরেই তাতেই 'হয় হয়' কর্যা তারি পাছে পাছে চলে। গাওয়ালী মানষের নিজেগোরে বৈঠকের বুদ্ধি পরামিশ সারা হৈলে মাস খানেক জমিদার বাড়ী হাটাহাটি করণের পর যে জাগাটা নতুন গেরাম পত্তণের লাগ্যা ঠিক হৈলো সেটা বংশীবাবু আর ভৈরব বাবু এই দুই জমিদারের ভারি একটা কাইজার জমি, ইলসামারির চরে। এইটা বাদে বংশীবাবুর নিজ এলাকার আরো যে সব চর নিঝঞ্ঝাটে আছে তার বেবাক গুলাই কাচি। তাতে গফুর সর্দ্দার গোরে গেরামের বেবাকের বাড়ীর সংগস্তা হয় না। গেরামের দুই চাইর জন মাতব্বরের এই খামাখা কাইজায় মাথা দেওনে বড় মত আচিলো না, তবে এক সাথে থাকনের মায়ায় শেষ কাঠালে সকলেই একমত হয়্যা ঠিক কর্‌লো বর্ষার পর কালে কাত্তিক মাসে গেরামের বেবাক মানুষ একদিনে একলগে নতুন জমি দখল কর্যা বস্‌ব্যো, তার পারে তাগোরে হাতের লাঠি আর মনিবের হুকুমের জোরে বরাতে যা আছে তাই।

ইদিগের তামান বন্দবস্ত সারা হৈলে পর সর্দ্দার কিছু কাল নিচিন্ত মনে জিরাণের লাগ্যা শশুর বাড়ী গেচে। পয়লা ২।৪ রোজ হাসি তামাসায় কাটানের পর একদিন নিরালায় বস্যা সর্দ্দারের বিবি সোয়ামির কাছে ঘর গিরস্তালির কথা তুল্যা বসল্যা। সে টান মুলুকে নতুন বাড়ী করনের যতগুলো নজির দিলো সর্দ্দার তা বেবাকই হাস্যা উড়াল্যো দেখ্যা বিবি খুব রাগ্যা তারে কয়েকটা চড়া কথা

শুনায়্যা দিলো। পরের বাড়ীতে এন্নিকর্যা ঘরের গুমর ফাক করনে সর্দ্দারের মেজাজ ও রুখ্যা উঠ্‌লো। আর তার ফলে কোন কিছু থির হওনের বদলে দুইজনের খালি রাগা রাগিই সার হৈলো। ইয়ার পর আর যে কয়দিন সে শশুর বাড়ী রৈলো বিবির লগে কাজের কথা আর কিছুই হৈলোনা। বাড়ীর আর আর মানষের কাছে সে রমজানের সমন্ধের কথা কিছু কিছু শুন্‌চিলো, তবে বিবি নিজেথিকা কিছু না কওনে সেও তা নিয়া কোন কথাই উঠায় নাই। সর্দ্দারের মনে অষ্টক্ষণ খালি নতুন গেরাম পওনের কথাটাই জাগ্‌ত্যচে।

কার্ত্তিক মাসের শেষা শেষি বর্ষার ভিজা স্যাৎস্যতা চরের জমি শুকায়্যা বেশ টনক হয়্যা উঠ্‌লে পর একদিন বংশী বাবুর লাঠ্যালরায়তের দল ইলাসামারির শূন্যা চরটারে রাতারিতির মধ্যেই এমুন কর্যা ফেলাল্যো যে আগের দিনও যে সব জাইলারা তার বাকে মাছ মার্যা, শুন্যা চরে চাল শুকায়্যা নিচে—পরের দিন বিহানে আস্যা চরের দিগে চোখ ফিরাত্যেই তাগোরে তাক্ লাগ্যা গেলো। কাতারে কাতারে কলা গাছের ধার দিয়া বাচারি ঘরের সাইর, তারো আবার পুরাণ খামখোটা পুরাণ দরির বান্ধন ছান্দন দেখ্যা একদিন আগে তো পাছের কথা, কোন কালেই যে সে জাগাটা পতিত পর্যা আচিলো ই কথা কে কব্যার পারে। এক রাইতের মধ্যে এতবড় জবর একটা কারসাজি যে হব্যার পারে ভৈরব বাবুর চর মুলুকের নায়েব তা স্বপনেও ভাবেন নাই। বেবাক দেখ্যা শুন্যা তিনি পয়লা চোটে এতই ঘাবরায়্যা গেলেন যে কর্ত্তারে না জানায়্যা, তিনির হুকুম না নিয়া গফুর খাঁর দলের কোন বাধাই তিনি দিলেন না। এই

তাবে জোপায়্যা তারাও জাগায় জাগায় আস্তা বাশের ঝোপ, নানান রকম গাছ গাছালির চারা বুন্যা দিয়া, সরকারী তদন্তের সোমে হাকিমের চোখে তাগোরে বস্‌তিটা যাতে সে দিনকার বল্যাই না ঠেকে তারি আয়োজন উর্যোগে মন দিলো। এই সকল পাচ রকম কামে ষড়্‌জালে সর্দ্দারের যখন নাওন খাওনের ফুর্‌সুৎ নাই তখন শশুরবাড়ী থিকা খবরের উপর খবর আস্‌ব্যার লাগ্‌লো রমজানের বিয়া ঠিক কর্‌ব্যার জন্যে একবার যাওনের লাগ্যা।

তোক্কা রমজানেয় বিয়ার কথা নিয়্যা তাগোরের দুই মায়ের সেই আলাপের পর তোক্কার বাপ তিন চাইর যাত্রায় আস্যা সর্দ্দারের দেখা না পাওনে রমজানের মামা বাড়ীর আর আর মান্‌ষের লগেই সম্বন্ধের যাকিছু ঘোর প্যাচের কথা বেবাক মিট্যায়া গেছে। এখন খালি দেইন্‌মোহরের টাকাটা লেইন দেইনের পর দিন তারিখ ঠিক করণ বাকী। সর্দ্দার না আইলে সেটা হব্যার পারে না। দুই বাড়ীর মান্‌ষে খালি তার অসনের পথই চায়্যা রৈচে।

অনেক খবরের পর মাত্র দিনেকের লাগ্যা সর্দ্দার শশুর বাড়ী আইচে। আঙিনায় পাও দিতে না দিতেই ছাওয়ালের বিয়ার কথা নিয়া শশুর বাড়ীর বেবাক মামুষে তারে ঝাক্যা ধর্‌লো। যে যা কিছু কৈলো সব তাতেই সে হাস্যা হাস্যা সায় দিলো দেখ্যা সকলেই খুব খুসি। বিবির টান-দেশে গিঃস্তালি করনের হাউস্‌টা না মিটাব্যার পর্যা তার মনে ভারি একটা খেদ রয়্যা গেচে তাই সে মনে মনে ঠিক কর্যা আইচে ছাওয়ালের বিয়া নিয়া বিবির পছন্দের উপরে সে কোন কথাই কইবো না। নিরালায় বিবি লগে যখন তার দেখা—তখন সে আপ্লেথিকাই রমজানের এই বিয়াতে তার

পূরা মত যে আছে এই জানায়্যা দেওনে বিবি তো আল্লাদে একিবারে ডগমগ। অনেক দিন পরে সে আইজ সোয়ামীর লগে পরাণ খুল্যা মনের কথা কব্যার লাগ্‌লো। নানান্‌ কথায় অনেক্ষণ কাটানের পর তোক্কার বাপের নাম আর ঠাই ঠিকানার পরিচয়টা উঠাত্যেই সর্দ্দার একিবারে থম্‌ ধর্যা গেচে। আকবর সেকের ম্যায়ার ঘরের নাতিনের লগে তার ছাওয়ালের সমন্ধের কথা চল্‌ত্যাচে—মাত্র এই খবরটাই সে এতদিন শুন্যা আস্‌ত্যাচে। ম্যায়ার বাপের বাড়ী যে হাতিবান্ধায় আর তার বাপ যে সেই গায়েরই জমিদার ভৈরব বাবুর রায়ৎ, ইয়ার কানি কোনাও যদি সে আগে টেরপাতো তায়ল্যে কার সাধ্যি এই সমন্ধ নিয়া ইস্তক নাগাদ কথা চালায়! যেখানে দুই মনিবের মধ্যে দিনরাইত বাঘে মইষের ঝগরা,—এক মনিবের রায়ত হুকুমের আগে আরেক পক্ষের রায়তের মাথায় লাঠি চালানের লাগ্যা এক পায় খারা—সেখানে দুই পক্ষের রায়তে রায়তে—কুটুম্বিতা? ইরকম জলে কচুপাতায় মিতালির কথা খালি এক নিমুখারামেরই মুখে খাটে। এই সবতা ভাব্‌ত্যে ভাব্‌ত্যে গফুর খাঁ অনেক্ষন তক রাও-চাও কিছুই কর্‌লো না। তারপর ফট্‌কর্যা উঠ্যা খারায়্যা যখন সে কৈলো—"না ইবিয়া কিছুতেই আমি হব্যার দিমুনা"—বিবির তখন কেমুন এক রকমের চমক লাগ্যা গেচে। যে মানুষ দণ্ডেক কাল ও কাটে নাই—হাসিমুখে এক কথা কৈলো, সেই মানুষ যে ঠোটের কোলা না শুকাত্যেই মুখটারে কালা আংরা কর্যা আরেক কথা কয়—তার সোয়ামিরি এমুন স্বভাব তো কোন কালেই আচিলো না। ক্ষনিকক্ষণ তব্দ লাগ্যা থাকনের পর বিবি যখন মাথা তুল্যা তাকাল্যো—সর্দ্দার

তখন আর সে ঘরে নাই। বিবির লগে কথা হওনের একটু পরেই শশুর বাড়ীর আর বেবাকেরেও আকবর সেকের নাতিন লগে রমজানের সম্বন্ধ করণে তার অমতটা খুব চোটে পাটে জানায়্যা সেই দিনই সে ইল্‌সা মারির চরে ফিরা গেচে।

সকল দিগে থিকাই বিয়াটা যখন পারায় ঠিক ঠাক হয়্যা আইচিলো এমুন সোমে মধ্যিখান থিকা বাপে আস্যা এই খামাখা নাবস্তা করনে রমজানও মনে মনে খুব রুখ্যা খারাল্যো। সে জিদ কর্‌য়া বস্‌লো—তোক্কারে তার বিয়া করণই চাই। অনেক খোসামুদ পরামুদে ও যখন তার মামারা কি আক্‌বর সেক কেউই সর্দ্দারের নিষেধ উল্টায়্যা রমজানের কথায় রাজী হৈলোনা তখন সে দুই বাড়ীর মান্‌ষের উপর খুব ফান্দি কুন্দি সুরু কর্‌য়া দিলো। তাতেও যখন কোন ফল হৈলোনা তখন একদিন বাড়ীর কাউয়্যা পক্ষীটারেও নাজানায়্যা সে কোথায় যে নিরুদ্দিশ হৈলো আশ পাশে তানা তানা তালাস কর্‌য়া ও তার কোনই ঠিকানা করণ গেলো না।

ইদিগে ছাওয়ালের লাগ্যা রমজানের মা যখন পাগল হয়্যা অন্নজল মুখে ছোয়ান ছাড়চে—এমুন সোমে একদিন খবর আইলো ইলসামারির চরের কাইজায় ভৈরব বাবুর তরপের এক লাঠ্যাল খুন হওনে দলের আরো কয়েকজনের লগে গফুর সর্দ্দারেরেও আসামী কর্‌য়া জেলার হাজতে চালান দিচে। ইষাত্রায় তার ফাটক নির্য্যাস। উপরা উপরি দুই দুইটা বুকফাটা দুঃখের চোট সর্দ্দারের বিবি সামলায়্যা উঠ্‌ব্যার পার্‌লোনা, সোয়ামির হাজতে যাওনের খবর শুননের দিন সেই যে সে শয্যা নিলো তার থিকা সে আর উঠে নাই।

* * * * * * * * *

চাইর বচ্ছর ফাটক খাটনের পর আইজ গফুর সর্দ্দার আর তার দলের আরো তিনজন আসামীর খালাসের দিন। জেলের দরজায় বংশী বাবুর চর মুলুকের নায়েব আর তিনির একধারে ভোজপুরী বরকন্দাজ রামদেও সিং খারা। রামদেওয়ের ডান হাতে সোনায় রূপায় নক্সাকরা পাকা বাশের গাইঠ্‌ তোলা একখান লাঠি, আর বাও হাতে একটা কাপরের বোচকা। দলের আর তিনজন লাঠ্যালের আগে আগে গফুর খাঁ জেলখানার দরজা পারয়্যা বাইরে আস্‌তেই—বরকন্দাজের হাতে থিকা সেই লাঠিখান নিজের হাতে নিয়া নায়েব মশয় গফুর খাঁর দিগে বারায়্যা দিয়া কৈলেন—"এই নেও সর্দ্দার কত্তা বাবুর বক্‌সীস্‌। রামদেও সিং সর্দ্দারের কাপর পিরণ আগে দিয়া তারপরে আর বেবাকেরে ছ্যাও।" গফুর খাঁ নায়েব মশয়রে সেলাম জানায়্যা ডান হাতে বক্‌শীশী লাঠিখান ধর্‌য়া কপালে ছায়াল্য তারপরে তিনির দিগে তাকায়্যা কব্যার লাগ্‌লো—বক্‌শীশ্‌ তো পাইলাম, ৪ বচ্ছর জেল খাট্যাও বাইরল্যাম, আরো চাইর বচ্ছর খাট্‌লেও দুঃখু আচিলোন,—এই কত কয়্যা ছল্‌ ছল্‌ চোখে কি জানি কি একটু ভাব্‌লো তারপরে মাথা খারা কর্‌য়া আবার কব্যার লাগ্‌লো—যা হওনের তাতো হয়্যাই গেচে, তার লাইগা আর আপসস্‌ করি না, তয় দুঃখু রয়্যা গেল এই বেবাক কাইজারই হাতিবান্ধার জমিদারের হট্যায়া দিয়াও এত সাধের চরটা কত্তা বাবুর দখলে রাখ্‌বার পার্‌লাম না। সর্দ্দার আরো কি জানি কব্যার লাগ্‌চিলো নায়েব মশয় তার মুখের কথা কার্‌য়া নিয়া কয়্যা উঠ্‌লেন—"সর্দ্দার খবর সবই ভাল। ইল্‌সামারির চর আবার তোমাগোরেই নতুন বস্‌তিতে ছায়্যা যাইবো। আর

সেখানে তোমার লাগ্যা কর্ত্তাবাবু চাইর খাদা ভূই লাখেরাজ মঞ্জুর কৈরাচেন। ইল্‌সামারির চরটা আমাগোরে দখলেতো চির কালের লাগ্যা আইচেই, ভগবান কৈর্‌লে ভৈরব বাবুর তামান জমিদারীটাই কালে কালে আমাগোরে কর্ত্তাবাবুর ছাওয়াল কোকন বাবুরই হৈবো। কিছুই বুঝব্যার নাপার্‌যা সর্দ্দার তিনির মুখের দিগে হা কর্‌যা তাকায়্যা রৈচে—দেখ্যা নায়াব মশয় কব্যার লাগল্যেন—সেইযে বছর দুয়েক আগে জেলখানায় যায়্যা তোমার লগে দেখা করি—তারপরে আইজ তক অনেক ঘটনাই ঘট্‌চে, আর তার মধ্যে আসল ঘটনাটা হৈলো—হাতিবান্ধার ভৈরব বাবুর ছাওয়াল পাওয়াল বৈল্‌তে সবার একই মায়্যা। আর সেই মায়্যারি লগে মাস আষ্টেক আগে আমাগোরে কোকন বাবুর বিয়া হয়্যা গেচে—এই বিয়ায়—নায়েব মশর কথার বাকীটুক তিনির মুখে থিকা বাইর হতে না হত্যেই জমিদারের দেওয়া সোনায় রূপায় নক্সিকরা লাঠীখান সর্দ্দারের মুঠের থিক্যা খস্যা ধপ্‌ কর্‌যা মাটিতে পর্‌যা গেলো। মাটিতে পরা সেই চক্‌চকা লাঠিটার দিকে বেবাকের নজর যাত্যে না যাত্যেই দেখা গেলো—সে নিজেও টাল খায়্যা পথের ধূলায় বস্যা পরচ্যে। সর্দ্দারেরে আচম্বিতে পথের মধ্যে এই ভাবে বস্যা পরত্যে দেখ্যা উপস্থিত বেবাকেরই খুব এক চোট ভাব্যা চাক্যা লাগ্‌লো। খানিকক্ষণ হেপাজতের পর সে যখন নায়েব মশর পাছে পাছে চলব্যার শুরু কৈর্‌লো তখনো তার মুখে রাও শব্দ কিছুই নাই।

সেদিনকার রাইতখান বংশীবাবুর জেলা সহরের বাসাবাড়ীতেই কাটায়্যা পরের দিন ভোর বিহানে নায়েব মশর লগে তাগোরে গায়ের দিগে যাওনের কথা। রাইত পোয়াল্যে পর যখন যাত্রার

সময় হৈলো—তখন দেখা গেলো সর্দ্দারের কোন নিশানাই নাই—খালি জমিদারের দেওয়া আগের দিনকার সেই লাঠীখান ঘরের মাইঝার এক কিনারে পৈরা রৈচে।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

কঃ পন্থা*

—:০:—

কিছুদিন হতে যার সঙ্গে দেখা হয় তিনিই জিজ্ঞাসা করেন—কঃ পন্থা।—এমন কি তাঁরাও যাঁরা দুদিন আগে নবাবিষ্কৃত পলিটিক্যাল নিবৃত্তি-মার্গকে, এক লম্ফে স্বরাজে উত্তীর্ণ হবার অদ্বিতীয় পথ বলে প্রচার করতেন এবং দেশশুদ্ধ লোককে সেই পথে খেদিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত নাটকে দেখতে পাই যে, সেকালের রাজা রাজড়ারা দু পা চলতে হলেই, বৃদ্ধ কঞ্চুকীকে আদেশ করতেন "মার্গং প্রদর্শয়।" এটা অবশ্য ছিল একটা রাজ-কায়দা। কেননা এ ঘর থেকে ও ঘর যাবার পথ বেচারা কঞ্চুকী যতটা জানত, রাজা বাহাদুরও নিশ্চয় ততটাই জানতেন। সেকালের রাজপ্রাসাদ ত আর গোলকধাঁধা ছিল না।

আজকের দিনে, আমাদের পরস্পরকে পরস্পারের এই পথ জিজ্ঞাসাটাও কি একটা স্বরাজ-কায়দা? আমার বিশ্বাস তা মোটেই নয়। স্বরাজের সিধে রাস্তা, ডাইনে কি বাঁয়ে, সুমুখে কি পিছনে, মাথার উপর কি পায়ের নীচে? সে কথা আজ আমরা নিঃসন্দেহে কেউ বলতে পারি নে, অথচ সবাই জানতে চাই, তাই না এত জিজ্ঞাসাবাদ।

(২)

একটা সোজা ও সিধে পথ, আমরা যে চট্ করে দেখিয়ে দিতে পারি নে, তার কারণ ইতিপূর্ব্বে বহু মহাজন বহু পথ দেখিয়েছেন,

* বিজলী হইতে উদ্ধৃত।

আর সে সব পথ যে অপথ, বহু বিজ্ঞজন তাও আবার প্রমাণ করেছেন। ফলে আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা। এ স্থলে পূর্ব্বাচার্য্যগণ-প্রদর্শিত গোটাকয়েক পথের উল্লেখ করা যাক্।

স্বরাজের পথ কারও মতে বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে আবার কারও মতে তা দেবালয়ের ভিতর দিয়ে। কেউ বলেন তা ছাপাখানার ভিতর দিয়ে, কেউ বলেন কারখানার ভিতর দিয়ে, কেউ আশা করেন যে তা কাউন্সিলের ভিতর দিয়ে, আবার কেউ বিশ্বাস করেন তা জেলের ভিতর দিয়ে।

এ সব মতের বিরুদ্ধে যে সব তর্ক উঠেছে—সেগুলি একবার স্মরণ করা যাক।—(১) বিদ্যালয়ের বাঙলা ত গোলামখানা। সেখানে আমরা গোলাম না বনে মানুষ হব কি করে? তারপর গোলাম কি কখনো স্বরাট হতে পারে? এ কথা কে না জানে যে এক তাসখেলা ছাড়া, জীবনের অপর কোন খেলাতেই গোলাম সাহেবের চাইতে বড় হতে পারে না। তারপর যাঁরা স্কুল কলেজের বিপক্ষে নন, তাঁরাও বলেন যে, যদি ভারতবর্ষের আপামর-সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ না হওয়া তক্, ভারতবাসী স্বরাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে,—তাহলে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর সে রাজ্যে প্রবেশ করা আমাদের ভাগ্যে ঘট্‌বে না।—অতএব ও পথ হয় অ-পথ নয় অনন্ত পথ।

(২) দেবালয়ের পথ ত পুণ্যপথ। ও পথ ধর্‌লে মানুষ যে দেবতুল্য হয়ে ওঠে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তবে কথা হচ্ছে এই যে ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি লোক যদি তেত্রিশ কোটি দেবতা হয়ে ওঠে তাহলে স্বরাজ্য ত কোন ছার, এ দেশ স্বর্গরাজ্য

হয়ে উঠবে। মানুষ দেবতা নয় বলেইত তার পক্ষে স্বরাজ্য বিরাজ্য সাম্রাজ্য যা হোক একটা না একটা রাজ্য চাই। নইলে অরাজ্যতেই ত কাজ চলে যেত। এ ছাড়া আর একটা কথা আছে। আমরা যদি সব দেবালয়ের পথ ধরি ত, হিন্দুর পথ হবে মন্দিরের ভিতর দিয়ে আর মুসলমানের মসজিদের। নিজ নিজ পথ ধরে আমরা চলব কাশীতে আর ওঁরা মক্কায়। তারপর মাঝপথে দুদলের মাথা ঠোকাঠুকিও হতে পারে। সত্য কথা এই যে এ পথ তখনই পুণ্যপথ, যখন তা হয় শূন্যপথ। কিন্তু স্বরাজ ত আশমানের নয়—জমিনের রাজ্য।

(৩) ছাপাখানা থেকে বেরয় ত এক কাগজ। কাগজের স্বরাজ্য ত তাসের ঘর। ও জিনিয় মানুষে তয়ের করে সুধু অবসর বিনোদনের জন্য। ওটা কাজ নয় খেলা। আমরা সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে স্বরাজ্যের তাসের ঘর ত অনেক বানিয়েছি কিন্তু তাতে করে মাটির স্বরাজ্যের দিকে এগিয়েছি কি পিছিয়েছি বলা কঠিন। জানোয়ারের ভিতর একমাত্র মানুষেরই ভাষা আছে অতএব কথা আমরা কইবই কিন্তু সেই এক কথার সাহায্যে স্বরাজ গড়ে তোলা অসম্ভব। স্বরাজ ত আর কাব্য নয়,—ইতিহাস, অর্থাৎ তা গড়ে তুলতে হয়, কলমে নয়, হাতে-কলমে।

(৪) ছাপাখানার উপর যাঁদের ভরসা নেই তাঁরা দেখিয়ে দেন কারখানার পথ। এঁদের কথা হচ্ছে বালবিধবার স্তনের মত "উত্থায় হৃদি লিয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথা।" অতএব আমরা ধনী না হলে স্বরাট হতে পারব না। ধনী হব কি করে?—উত্তর—হাতুড়ি পিটে। কারখানা হচ্ছে আসলে টাঁকশাল তাই এস সকলে

মিলে সেখানে ঢুকে লোহা পিটে সোনা তৈরি করি,—তারপর সেখান থেকে বস্তা বস্তা মোহর মাথায় করে যেখানে আসব; তারি নাম স্বরাজ। এর উত্তরে লোকে বলে টাঁকশাল হাতে না থাকলে, কারখানা চালানো যায় না। যার ধন নেই তাকে সুধু পেট-ভাতাতেই হাতুড়ি পিট্‌তে হয়। সুতরাং কারখানার ভিতর দিয়ে আমরা টাঁকশালে নয় হাঁসপাতালে গিয়ে পৌঁছব।

(৫) কাউন্সিলের ভিতর দিয়ে কি করে স্বরাজ্যে যাওয়া যায় তা বাঙলার নূতন লাট একটি উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন এ পারে রয়েছে অধীনতা আর সাত সমুদ্র তের নদীর পারে স্বাধীনতা,—কাউন্‌সিল হচ্ছে এ উভয়ের মধ্যে সেতু, এই সেতু ধরেই আমরা ওপারে গিয়ে উঠব। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—কাউন্সিল Bridge বটে কিন্তু ও Ass's bridge অতএব ও সেতু আমরা পার হতে পারব না। আর যাঁরা কাউন্সিলের পক্ষেও নন বিপক্ষেও নন, তাঁরা বলেন—যে ও সেতু অবলম্বন করবার পূর্ব্বে জানা দরকার সেতুটা কতখানি লম্বা আর তা টেঁকসই কি না। যা স্থলপথ ভাবা গেছ্‌ল তা যদি জলপথ হয়ে দাঁড়ায় তাহলেই ত ডুবেছি। অথবা স্বরাজ্যের সেতু যদি স্বর্গের সিঁড়ির মত অফুরন্ত হয় তাহলে তা পার হবার জন্য চাই অনন্ত জীবন।

(৬) জেলের পথটা যে স্বরাজের রেলের পথ এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। ওখানে ঢোকা সহজ বেরনই কঠিন, কারণ এর প্রথমটি আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ দ্বিতীয়টি নয়। আসলে ও পথটা হচ্ছে একটা চোরাগলি। কেউ কেউ এ আপত্তিও তোলেন যে, আমরা ত শাস্ত্রের শাসনে সমাজের জেলখানাতেই বাস করছি,

কেউ কেউ আবার বলেন যে, আমরা ত সংসার গারদে যাবজ্জীবন মেয়াদ খাটছি, সুতরাং ওখান থেকে বেরবার যদি কোনও পথ থাকে ত সঃ এব পন্থা। এ সব হচ্ছে নৈতিক ও দার্শনিক আপত্তি, রাজনৈতিক নয়, অতএব উপেক্ষনীয়। একমাত্র পলিটিক্‌সের দিক দিয়ে যাঁরা এ পথ ধরেছিলেন এবং ধরিয়েছিলেন, তাঁরাও আজ বলছেন, থুড়ি। জেলে নিজে যাওয়াতে নাকি স্বরাজ্যের ক্ষতি, অপরে নিয়ে যাওয়াতেই লাভ। অতএব দাঁড়াল এই যে, যে পথটা আমাদের ধরে নিয়ে যাবার পথ সেটা আমাদের ধরবার পথ হতে পারে না।

(৩)

এই সব পণ্ডিতের বিচারের ফলে দাঁড়াল এই যে, এ সব পথের কোনটা যে স্বরাজের একমাত্র পথ, এ কথা এখন আর কেউ বলতে পারে না। তাই বলে যে ধরে নিতে হবে, যে "কঃ পন্থার" উত্তর "ন পন্থা" অবশ্য তাও নয়। সম্ভবতঃ উক্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর হচ্ছে উপরোক্ত সব কটিই পথ। অন্ততঃ এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে যে ও কটি পথ বন্ধ করার নাম নূতন পথ খোলা নয়।

জীবনের স্রোত সমাজের ভিতর দিয়ে নানা দিকে নানা আকারে বয়ে যাবে, এই হচ্ছে ভগবানের নিয়ম। যদি এ কথাও মানা যায় যে দেশকাল হিসেবে, এই শত ধারার মধ্যে একটি না একটি ধারা প্রবল হয়ে উঠবে, তাহলে সেই সঙ্গে এও মানতে হবে যে অপর সকল ধারা যার শাখা উপশাখা নয়, সে জীবন-গঙ্গা দু দিনে মরাগাঙে পরিণত হবে।

এতক্ষণে আসল কথায় আসা যাক্। পৃথিবীতে এমন কোনও

তৈরি পথ নেই যা ধরে আমরা চোখ বুঁজে সোজা ও চোঁচা স্বরাজে গিয়ে পৌঁছব! ওহেন পথ সুধু যে নেই তা নয়, থাক্‌তেও পারে না। তৈরি পথ মানেই পরের হাতে গড়া পথ। স্বরাজের পথ কিন্তু গড়ে তুলতে হবে আমাদের পায়ে পায়ে অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেককেই যুগপৎ পথিক ও পথকর্ত্তা হতে হবে। এক কথায় পথিক গড়ে উঠলে পথও আপনি গড়ে উঠবে।

১২ই এপ্রিল, ১৯২২। বীরবল।

জেনোয়া কনফারেন্স।

—:*:—

সেকালের একজন রোমান কবি বলেছেন যে—"তীরে বসে সমুদ্রে জাহাজডুবি দেখতে বেশ মজা লাগে।" এ ধরণের কথা অবশ্য আমাদের মুখে শোভা পায় না। কেননা উক্ত রোমান কবি Lucretius ছিলেন ঘোর materialistic আর আমরা হচ্ছি জোর আধ্যাত্মিক। তাই সেদিন বাঙালির লেখা একখানি ইংরাজি খবরের কাগজে Genoa Conferenceকে farce বলা হয়েছে দেখে একটু অশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

লেখক মহাশয়ের কথা হচ্ছে ও conference ফেঁসে যাবে। তা যদি যায় তাহলে ত সেটা একটা মস্ত হাসির জিনিষ হবে না। গতযুদ্ধে সে দেশে বহুকাল ধরে মানুষের তন-মন-ধন দিয়ে গড়া ঘরসংসার একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, সেই ভগ্নাবশেষ থেকে আবার নূতন সংসার গড়ে তোলাটা হচ্ছে তাদের পক্ষে জীবন-মরণের কথা। মৃত্যুমুখে পড়লে বাঁচবার চেষ্টা জীব মাত্রেই করে থাকে, এমন কি সেও যে নিজের দোষে নিজে যমের দুয়োরে পৌঁচেছে। এ ব্যাপারের ভিতর হাস্যকর কিছুই নেই। তবে এ কথা সত্য যে কোন বিষয়ের উদ্দেশ্য আমাদের মনঃপুত হলেও তার উপায়টা আমরা হাস্যাস্পদ মনে করতে পারি। এক্ষেত্রে সে দেশে জ্ঞাতি-

শত্রুতার ফলে যে সর্ব্বনাশ ঘটেছে নূতন কুটুম্বিতার সাহায্যে তার প্রতিকার করবার চেষ্টা হচ্ছে। এ ছাড়া অপর কি উপায় ইউরোপের লোক অবলম্বন করতে পারত, তা আমার বুদ্ধির অগম্য, যুদ্ধপর্ব্বের পর শান্তিপর্ব্ব রচনা করাই হচ্ছে, শুধু কাব্যের নয়, জীবনেরও নিয়ম। ইউরোপের এ চেষ্টা যদি বিফল হয়, তাহলে সেটা যে একটা মহা ট্র্যাজেডি হবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। আর ট্র্যাজেডিকে প্রহসন বলায় রসজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না, অতএব আধ্যাত্মিকতারও নয়। রসই যে আত্মা এই হচ্চে অধ্যাত্মশাস্ত্রের মুলসূত্র। তবে রসজ্ঞান কাউকে কেউ দিতে পারে না। অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে "রস" হচ্ছে "সহৃদয়ানাং হৃদয় বেদ্য"।

এর উত্তরে খবরের কাগজ-ওয়ালারা কি বলেবেন তা জানি। তাঁদের সাক্রোশ জবাব হবে এই যে—"রাখো তোমার কবিত্ব। আমাদের যা অবস্থা তাতে ইউরোপের উপর হৃদয়ের বাজে খরচ করবার এখন আমাদের সময় নয়। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে নিজের চরকায় তেল দেওয়া; পরের ভাবনা পরে ভাবা যাবে।" এ হচ্ছে কাজের কথা—অতএব এর বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই, শুধু একটি কথা ছাড়া। পরের ভাবনা ভাববার জন্য কেউ কারও মাথার দিব্যি দেয় নি,—কিন্তু যদি ভাবো ত ঠিক করে ভাবাই উচিত। দুইয়ে দুইয়ে ঠিক দেবার সম্ভবত কারও গরজ নেই, তবে কেউ যদি সখ করে তা দেয় তবে তার ফলে চার হওয়া উচিত। ছেরেফ আঁকের হিসেব থেকে দেখলেও দেখা যাবে এই Genoa ব্যাপারটা ঠিক হাসির ব্যাপার নয়। একের সম্পদ অবশ্য অপরের সম্পদ নয়, কিন্তু একের বিপদ অনেক ক্ষেত্রে অপরেরও বিপদ। দুনিয়ার এ

একটা অদ্ভুত নিয়ম যে, স্বাস্থ্য সংক্রামক নয়, কিন্তু রোগ একজন আর একজনকে অনায়াসে দিতে পারে। পাশের বাড়ীর লোকের প্লেগ হলে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারিনে, আনন্দ ত কর্‌তেই পারি নে, যদিচ সে লোক আমাদের শত্রুও হয়। অট্টালিকাতে আগুন লাগলে তার পার্শ্বস্থ পর্ণকুটীর দগ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে। সে অট্টালিকা রাজার আর সে পর্ণকুটীর সন্ন্যাসীর হলেও আগুন উভয়ের প্রতি সমান ব্যবহার করে। ধ্বংসশক্তির Conscience নেই। এই দেখুন না কেন?—ইউরোপ করলে যুদ্ধ, সঙ্গে সঙ্গে দেউলে হলুম আমরা। Genoa-Conferenceএর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ার এই দেউলে অবস্থা থেকে মানুষের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা। দেনদার দেউলে হলে পাওনাদারও দেউলে হয়, আর আজকে পৃথিবীর সকল জাতির পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের দেনা পাওনার সম্বন্ধ। এইত হয়েছে মুস্কিল। সুতরাং ইউরোপের জীবন-তরী ফাঁসতে দেখে আমরা হাসতে পারি নে। কারণ সত্য কথা এই যে, আমরা তীরে বসে নেই, আমাদেরও ঐ জাহাজে চড়ানো হয়েছে—অবশ্য deck passenger করে। সুতরাং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শটি idealist-এর গাঁজাখুরী নয়, তার হন্তারক হওয়াটাই realist-এর মাতলামি।

পৃথিবীর সকল ভূভাগের মত, ইউরোপেও idealistএর সংখ্যা অতি কম, আর realistএর সংখ্যা অতি বেশি। যে ব্যক্তি নামে না ভোলে সেই এ সত্য জানে। অপর পক্ষে realistরা যে জনসাধারণের কাছে নিজেদের idealist বলে চালিয়ে দেয়—এ সত্য তার কাছে কখন গোপন থাকে না যে তাদের ভাব ব'লে ভুল

করে না, বেশকে দেহ ব'লে ভুল করে না। কিন্তু গোল ঘটেছে এতেই যে, জনসাধারণ ভাষা ও বেশেরই বশ।

এই কারণে Genoaর মেলামেশা যে নানা জাতের আত্মীয়তায় পরিণত হবে, এ আশা আমি করিনে। রাগ মানুষের যত শীগ্‌গির হয় তত শীগ্‌গির পড়ে না। সে যাই হোক, ও Conferenceএর উপর আমাদের যখন কোন হাত নেই, আমরা এ ক্ষেত্রে যখন দর্শক মাত্র, তখন ওখানে যা হচ্ছে, তাকে অভিনয় হিসেবে দেখা আমাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। আমার কাছে এই নাটকটি হচ্ছে একটি tragi-comedy,—অর্থাৎ সেখানে আজ যা হচ্ছে তা comedy আর কাল যা হবে তা tragedy। যাঁরা সকল জাতির স্বার্থসিদ্ধি কর্‌তে একত্র হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকে শুধু নিজের স্বার্থই দেখছেন। যে মনোভাবের প্রসাদে যুদ্ধ ঘটেছিল, সেই মনোভাব নিয়ে শান্তি-স্থাপনার চেষ্টা হচ্ছে। কাজেই পরস্পরের ভিতর সুধু বকাবকি চটাচটি হচ্ছে। উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের এতাদৃশ গরমিল দেখলে দর্শকের কাছে ব্যাপারটা হাস্যকর হবেই হবে। স্বার্থ অবশ্য কোন জাত স্বেচ্ছায় ছাড়তে পারে না, এবং কোন জাত কোন অপর জাতকে ছাড়তে আদেশ করতে পারলেও, অনুরোধ করতে পারে না। তোমরা সকলে ভাল হও আর আমার ভাল হোক, এমন কথা মনে থাকলেও মুখে আনা কঠিন। কিন্তু একের স্বার্থের সঙ্গে অপর সকলের স্বার্থের যোগ করাটা কি এতই অসম্ভব? আমরা যাকে সমাজ বলি তা বহু ব্যক্তির বিভিন্ন স্বার্থের যোগাযোগের উপরেই ত খাড়া রয়েছে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি মিলে যখন সমাজ গড়তে পেরেছে তখন জাতির সঙ্গে জাতি মিলে একটা সকল জাতীয় সমাজ

কি কখনো গড়ে তুলতে পার্‌বে না? আমার বিশ্বাস ওরূপ আন্তর্জাতিক সমাজ-গঠন মানুষের পক্ষে সহজ না হলেও অসম্ভব নয়।

নানা জাতির এই সন্ধির ভিত্তি হবে কি বিশ্বপ্রেম? অবশ্য নয়। স্বজাতির প্রতি ভালবাসার চাইতে বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ মানুষের পক্ষে ঢের বেশি স্বাভাবিক। সুতরাং হঠাৎ যে একদিন পৃথিবীর সকল জাতি পরস্পর পরস্পরের ভালবাসায় পড়ে যাবে তার কোনই সম্ভাবনা নেই। আর যদিও একদিন তা হয় তাহলে দুদিন সে প্রণয় টিঁকবে না। বিজয়ার দশমীর কোলাকুলি যে একাদশীর দিন দলাদলীতে পরিণত হয়—এ ত তোমার আমার চোখে দেখা সত্য। হৃদয়ের মত অস্থির জিনিষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

তবে কি সে ভিত্তি হবে মানুষের ন্যায়বুদ্ধি? নীতি যদি স্বার্থের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হয় তা হ'লে তা হয় আকাশকুসুম; আর যেখানে এ দুটি পরস্পর বিরোধী হয় সেখানে নীতি হারে স্বার্থ জেতে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এ কথা লেখা আছে। তাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা একই শাস্ত্রকে কখনো নীতিশাস্ত্র বলেছেন, কখনো অর্থশাস্ত্র বলেছেন।

তাহলে দাঁড়াল এই যে যেমন মানুষের, তেমনি জাতির সঙ্গে জাতির স্বার্থ সমন্বয়ের মূলে থাক্‌বে অর্থের সমন্বয়। আমি ভোক্তা আর তুমি কর্ত্তা অথবা তুমি ভোক্তা আর আমি কর্ত্তা যতদিন আমরা পরস্পর এই মনোভাব পোষণ করব, ততদিন আমরা মারামারি কাটাকাটি করবই। আমাদের সকলকেই যুগপৎ কর্ত্তা ও ভোক্তা হতে হবে এই সুবুদ্ধি মানুষের মাথায় যেদিন ঢুকবে তখন বিশ্বমানবের

মৈত্রীর গোড়া পত্তন হবে। এ সত্য মানুষে শুনে শিখতে পারবে না, তাকে ঠেকে শিখতে হবে। মানুষ আজ যে বিপদে ঠেকেছে, তাতে করে তার এ বুদ্ধি জন্মান আশ্চর্য্য নয়। এই স্বার্থজ্ঞান জন্মালে তার অনুরূপ ন্যায়বুদ্ধিও জন্মাবে, কেননা মানুষের আর্থিক ব্যবহারের শাসন কর্ত্তা হচ্ছে তার ন্যায়বুদ্ধি। তার পর চাই কি সেই নবনীতি থেকে তার মনে নবপ্রীতিও জন্মলাভ করতে পারে। ইতিমধ্যে প্রতি জাতকে, মনে, চরিত্রে, ব্যবহারে, নিজেকে এমন করে গড়ে তোলবার চেষ্টা কর্‌তে হবে যার ফলে সে জাত অপর জাতের বিদ্বেষ নয়, প্রীতি আকর্ষণ কর্‌তে পারে। এর কোনটিই মানুষের অসাধ্য নয়। তাই আমি বিশ্বাস করতে ভালবাসি—মানব সভ্যতার এই চরম আদর্শ একদিন না একদিন বাস্তবে পরিণত হবে। এ বিশ্বাস হারালে মানুষ যে বাদবাকী চারপেয়ে জানোয়ারের চাইতে শ্রেষ্ঠ জীব সে বিশ্বাসও হারাতে হয়, আর তা হারালে কাব্য কলা দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্মনীতি সব এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায়; বাকী থাকে সুধু ঘাস আর বিচিলি।

আমার এ বিশ্বাসের কথা শুনে যদি কেউ বলেন যে আমি জেগে স্বপ্ন দেখছি—তার উত্তরে আমি বলব "হাঁ তাই"। ভবিষ্যতের স্বপ্ন যখন আমাদের দেখতেই হবে, তখন দুঃস্বপ্ন দেখার চাইতে সুস্বপ্ন দেখাই ভাল।

আর এক কথা। সাদা লোক আত্মহত্যা করলে যে কালো লোক সব অমৃতস্য পুত্রাঃ হবে, এ হেন দুরাশা মানুষে অচৈতন্য না হলে করতে পারে না। স্মরণ রাখবেন যে, রঙ চর্ম্মের ধর্ম্ম। আর নানা রঙের চামড়ার নীচে আছে একই রক্ত মাংস আর সেই রক্ত

মাংসের দাবী মিটিয়েই সাদা কালো, সকলকেই আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি করতে হবে। গোল ত এখানেই। আত্মা অশরীরী হলে ত তার আর কোন বালাই থাক্‌ত না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

২৮শে এপ্রিল ১৯২২।

———